সেখানে নিভৃত অবকাশে তুমি
সংগ্রহ করছিলে দুর্গমের রহস্য,
চিনছিলে জলস্থল-আকাশের দুর্বোধ সংকেত,
প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদু
মন্ত্র জাগাচ্ছিল, তোমার চেতনাতীত মনে।
বিদ্রূপ করছিলে ভীষণকে
বিরূপের ছদ্মবেশে,
শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে
আপনাকে উগ্র ক'রে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায়
তাণ্ডবের দুন্দুভিনিনাদে॥

হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নীচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে,
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হলো ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে,
দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে॥

সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়
মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা
সকালে সন্ধ্যায় দয়াময় দেবতার নামে;
শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে;

কবির সংগীতে বেজে উঠেছিল
সুন্দরের আরাধনা॥

আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্ত গহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল—
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এসো যুগান্তের কবি,
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে;
বলো 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত ভারতী ও বালক পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে 'Song Offerings' এর জন্যে। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা। কবির প্রথম জীবনে লেখা কাব্যগ্রন্থগুলি হলো — 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাতসঙ্গীত', 'ছবি ও গান', 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এবং 'কড়ি ও কোমল'। ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৬ — মাত্র আট বছরে কবি প্রতিভার যে অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছে তারই চিহ্ন সুমুদ্রিত এই পর্বের চারখানি কাব্যগ্রন্থে — 'মানসী', 'সোনারতরী', 'চিত্রা' ও 'চৈতালি'তে। এই পর্বের কাব্যগুলিতে কবির আত্মোপলব্ধিই শুধু নয়, তাঁর কাব্যে নির্মাণ কৌশলেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আবেগ, গভীর আত্মপ্রত্যয়, জীবন জিজ্ঞাসা, কল্পনার পক্ষ বিস্তার, শিল্পরূপ নির্মাণে দক্ষতা, ভাষা ও ছন্দের ওপর আধিপত্য প্রভৃতি কবির যাবতীয় গুণাবলির প্রকাশ ঘটেছে এই পর্বের কবিতাবলিতে। এরপর কবি রচনা করেন কণিকা, কথা ও কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা ও নৈবেদ্য। গীতাঞ্জলি পর্বের প্রধান তিনখানি কাব্যগ্রন্থ গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি, ১৯১৬ তে বলাকা, ১৯২৫ এ পূরবী এবং ১৯২৯-এ মহুয়া রচনা করেন কবি রবীন্দ্রনাথ। 'পুনশ্চ' থেকে রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্বের শুরু। এ পর্বের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো 'শেষ সপ্তক', 'প্রান্তিক', 'নবজাতক', 'সানাই', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' ইত্যাদি।

লোকমাতা রানি রাসমণি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

১২০০ বঙ্গাব্দ, ১১আশ্বিন, বুধবার সকালে, হালিশহরে মাহিষ্যবংশে রাসমণির জন্ম। দরিদ্রের কন্যা। পিতা স্থানীয়ভাবে পরিচিত ছিলেন হারু ঘরামি নামে। হারু ঘরামির মেয়ে রাসমণি। মায়ের নাম রামপ্রিয়া। মা টুকটুকে ফর্সা এই মেয়েটির নাম রাখলেন রানি। পরে হবে রাসমণি। আর গ্রামবাসীরা দুটি নাম একত্রিত করে বলতে লাগলেন, রানি রাসমণি। একদিন যে সত্যই তিনি রানি হবেন। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই, বাংলার রানি রাসমণি। দু'জনেই যুদ্ধ করবেন ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে।

পিতা হরেকৃষ্ণ, লোকমুখে হারু। সামান্য লেখাপড়া জানতেন। মেয়েকেও শিখিয়েছিলেন। যে পল্লিতে তিনি বাস করতেন একমাত্র তাঁরই বাড়িতে রাতে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি পাঠ করা হতো। গ্রামবাসীরা লণ্ঠন হাতে শুনতে আসতেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! বালিকা রাসমণি অবাক হয়ে দেখতেন — অন্ধকার পথে আলোর সারি মাঠ পেরিয়ে, যেন বাতাসে ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে। আলো হাতে এসেছিল তীর্থে, এখন ফিরে যাচ্ছে সবাই দল বেঁধে। সব মানুষের ভেতরেই যেন দুটো মানুষ থাকে। মামলা, মোকদ্দমা, দলাদলি, মারামারি, অভাব, অসুখ সবই আছে কিন্তু রাতের আলোয় অতীতের পথ চিনে নেওয়ার আগ্রহ কিছু কম নেই। মহাভারতের-ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ, রামায়ণের রাম, লক্ষ্মণ, সীতা— সবাই আছেন, চিরকাল থাকবেন। রাসমণির বালিকা হৃদয়ে একটা সুখ-সুখ ভাব আসে। ভীষণ একটা ভালোলাগা।

বৈষ্ণব পরিবার। গলায় তুলসীর মালা, নাকে তিলক। এই তিলক আঁকায় সকলেরই কিছু সময় যায়। তা যাক। এ যে ধর্ম! রাসমণিও অতি নিষ্ঠার সঙ্গে নাকে, কপালে, বাহুতে তিলক আঁকতেন। সুন্দরীকে আরো সুন্দর দেখাতো। রাসমণির মা রামপ্রিয়া বেশিদিন বাঁচেননি। রাসমণি সাতবছরে পা দিয়ে দেখলেন মা নেই। তিনি মা-হারা। মাত্র আটদিনের জ্বরে পরলোকে চলে গেলেন রামপ্রিয়া।

রাসমণির বয়স হলো এগারো বছর। চোখে পড়ার মতো সুন্দরী। সেই সময় কলকাতায় অনেক বড়োলোক। বড়ো বড়ো লোক। একদিকে জোড়াসাঁকো, অন্যদিকে জানবাজার, মাঝখানে মানিকতলা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্রিন্স দ্বারকানাথ, মানিকতলায় রাজা রামমোহন, সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সিমুলিয়ার দত্তবংশ — যেখানে আসবেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিদেশিরাও এসে গেছেন — ডেভিড হেয়ার ঘড়ির ব্যবসা বন্ধ করে শিক্ষার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছেন। আলেকজান্ডার ডাফ সাহেব খ্রিস্টধর্মের প্রচারে উদ্যোগী। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে দেবেন্দ্রনাথ বড়ো হচ্ছেন। ব্রাহ্মসমাজের দরজা এইবার খুলবে। বাঙালির জাগরণের কাল ধর্মে-সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে। বাঙালি ব্যবসাতেও নেমেছে। লক্ষ্মীলাভের সুযোগ এসেছে। সমুদ্র ডাকছে। স্বদেশ, বিদেশে বিপুল বাণিজ্য।

কলকাতার জানবাজার। অনেক অনেক বছর আগে জন সাহেব এখানে একটি বাজার করেছিলেন। লোকমুখে জনবাজার হয়ে গেল 'জানবাজার'। এখন যেখানে ফ্রিস্কুল স্ট্রিট, নিউ মার্কেট — তারই পাশে। এই জানবাজারের এক ধনী বাঙালির নাম প্রীতিরাম দাস। ছিলেন গরিব, হয়েছেন ধনকুবের। কেউ করে দিতে পারে না, নিজেকে হতে হয়। এই হলো জগতের নিয়ম। উদ্যোগী পুরুষের লক্ষ্মী, সরস্বতী দুটিই লাভ হয়। পলাশিযুদ্ধের চারবছর আগে ১৭৫৩ সালে এক দরিদ্র পরিবারে প্রীতিরামের জন্ম। গুরুমশায়ের পাঠশালায় সামান্য বাংলাভাষা ও গণিত শিখেছিলেন, এমন সময় পিতা এবং মাতা দুজনেই মারা গেলেন। তখন প্রীতিরামের বয়স চোদ্দো বছর। এইবার কী হবে! একা তো নয়। পরপর দুটি ভাই — রামতনু ও কালীপ্রসাদ। চোদ্দো বছরের দাদা মহা চিন্তায় পড়লেন। ভাগ্যদেবীর পরীক্ষা!

জানবাজারে সেই সময় বাস করছেন বিখ্যাত জমিদার মান্নাবাবু। সেই পরিবারের গৃহিনী প্রীতিরামের এক পিসি। প্রীতিরাম তাঁর দুই ভাইকে নিয়ে এই মান্নাপরিবারে আশ্রয় নিলেন। উদ্যোগী প্রীতিরাম জীবনের কাছে হার স্বীকার করার জন্যে জন্মাননি। ইতিহাসের উপাদান। ইংরেজের কলকাতা। চতুর্দিকে টাকা উড়ছে। ধরতে পারলেই ধনী। প্রীতিরাম অল্প, কাজ-চলা গোছের ইংরিজি শিখে দালালি ও ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে রসদ যোগাবার কাজে নেমে পড়লেন। ইংরেজ সৈন্যদের মাল সরবরাহ। ফোর্টের এক পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর সুনজরে পড়লেন প্রীতিরাম। ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। তিনি ওই সাহেবের সঙ্গে ঢাকায় গেলেন। সাহেবের সুপারিশে নাটোর রাজদরবারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হলেন। প্রচুর টাকা রোজগার করে ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে আবার কলকাতায় ফিরে এলেন, তখন তাঁর বয়স চব্বিশ। যুবক প্রীতিরাম। যথেষ্ট বিত্তশালী। আশ্রয়দাতা মান্নাপরিবারের যুগল মান্নার এগারো বছরের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হলো। যৌতুক হিসাবে পেলেন জানবাজারের কয়েকখানা বাড়ি ও ষোলো বিঘা জমি। পর পর দুটি পুত্রলাভ করলেন। ১৭৭৯ সালে প্রথম পুত্র হরচন্দ্র, ১৭৮৩-তে দ্বিতীয় পুত্র রাজচন্দ্র।

প্রীতিরামের ভাগ্য তর তর করে এগোচ্ছে। কলকাতাও ক্রমশ জমজমাট হচ্ছে। প্রীতিরাম আমদানি, রপ্তানির ব্যবসা শুরু করলেন। ১৭৮৭ সালে বার্ন কোম্পানির মুৎসুদ্দি হলেন। মুৎসুদ্দি আরবি শব্দ, বাংলা অর্থ প্রধান, প্রতিনিধি। নাটোররাজের অধিকারস্থ কয়েকটি পরগনা খাজনা বাকি পড়ায় নিলামে উঠল। ১৮০০ সালে। প্রীতিরাম দেওয়ান শিবরাম সান্যালের সহায়তায় উনিশ হাজার টাকায় মকিমপুর পরগনাটি কিনে নিলেন। ছোটোভাই কালীপ্রসাদকে এই পরগনার নায়েব নিযুক্ত করলেন। তিনি সেখান থেকে জানবাজারের বাড়িতে বাঁশ, কাঠ, মাছ চালান দিতে লাগলেন। প্রীতিরাম ওইসব পণ্য বিক্রির জন্যে বেলেঘাটায় একটি আড়ত খুললেন। সেকালে অনেক বাঁশ একসঙ্গে বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে আনা হতো। একে চলিত কথায় বলা হতো, 'বাঁশের মাড়'। বংশব্যবসায়ী প্রীতিরাম ব্যবসাগত উপাধি লাভ করলেন, 'মাড়'। এই সময়েই বেলেঘাটায় তিনি একটি লবণের আড়তও স্থাপন করলেন। ধনলাভের সব পথই খুলে গেল। অনাথ প্রীতিরাম কলকাতার এক নম্বর বড়োলোক।

প্রীতিরাম তাঁর দুই পুত্রকে সেই যুগানুসারী লেখাপড়া শেখালেন। কলকাতা সেইসময়ে শিক্ষার আলোকে জাগছে। ছেলেদের বিবাহ দিলেন। বড়ো ছেলে হরচন্দ্র এত সুখ, এত প্রাচুর্য বেশিদিন ভোগ করতে পারলেন না। নিঃসন্তান স্ত্রীকে রেখে চিরবিদায় নিলেন অকালে।

১৮০২ সালে কনিষ্ঠপুত্র রাজচন্দ্রের বিবাহ দিলেন। বছর না পেরোতেই স্ত্রী-বিয়োগ। পরের বছরে আবার বিবাহ। এবারেও সেই একই ব্যাপার। বিয়ের বছরেই স্ত্রীর মৃত্যু। আশ্চর্যের ব্যাপার! হ্যাঁ, আশ্চর্যই। এইবার রাজচন্দ্রের স্ত্রী হয়ে আসবেন অলৌকিক এক রমণী, শক্তিরূপা। জানবাজার, জানবাজারের এই পরিবার এবং এই বঙ্গদেশকে তাঁর অবদানে সমৃদ্ধ করবেন। ইতিহাসে সংযুক্ত করবেন উজ্জ্বল এক অধ্যায়। বাংলার নবজাগরণের পুরোহিত।

প্রীতিরাম রাজচন্দ্রের আবার বিবাহ দেবেন। পাত্রীর খোঁজ চলেছে। রাজচন্দ্র শিক্ষিত, সংযত, ধর্মপ্রাণ। মাঝে মাঝেই নৌকা করে ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করতে যান। এইরকম এক নৌকাভ্রমণের সময় দূর থেকে কোনার ঘাটে সুন্দরী একটি মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। জানবাজারে ফিরে এসে তাঁর ভালোলাগার কথা পরিজনদের জানালেন। ঘটকদের অনুসন্ধান শুরু হলো। খবর এল, কন্যাটির পিতা হরেকৃষ্ণ দাস। প্রীতিরাম তাঁর পুত্রের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। হরেকৃষ্ণ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। এমনও হয় নাকি!

কলকাতার সেরা ধনীর ছেলের সঙ্গে দরিদ্রের কন্যার বিবাহের প্রস্তাব। এ কোনো অলৌকিক ঘটনা! পৃথিবীর ঘটনা। তবু বলতে হয়, ছেলেবেলায়, যখন বয়েস আরো কম, রাসমণি ডুমুরের ফুল দেখেছিলেন, যা সাধারণত দেখা যায় না। তাঁর মা বলেছিলেন, 'সে কি রে? রানি! তুই তা হলে সত্য সত্যই রানি হবি!' তাঁর দেখা হলো না।

১৮০৪ সালে রাজচন্দ্রের সঙ্গে রাসমণির বিবাহ হলো। সমারোহ, ধুমধাম। এ কি শুধু বিবাহ? প্রথমে তাই। শেষে ইতিহাস। তখন আর প্রীতিরাম, রাজচন্দ্র, জানবাজার নয়। ঊনবিংশ শতাব্দী ও রানি রাসমণি। প্রীতিরামের জীবদ্দশায় রাজচন্দ্র ও রাসমণির দুটি কন্যা হলো — পদ্মমণি ও কুমারী। ১৮১৩ সালে প্রীতিরাম জানবাজারের বর্তমান সুবৃহৎ পারিবারিক আবাস নির্মাণের কাজ শুরু করান। ১৮১৭ সালে চৌষট্টি বছর বয়সে প্রীতিরাম দাস পরলোকগমন করেন। সেই সময় স্থাবর ও অস্থাবর মিলিয়ে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা।

প্রীতিরামের সুযোগ্য পুত্র রাজচন্দ্র। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। আধুনিক মনোভাবাপন্ন। কুসংস্কারমুক্ত উদার প্রকৃতির যুবক। পিতার ব্যবসা ও সম্পত্তির হাল ধরলেন। ইংলন্ডে কলভিন কাউই কোম্পানিকে এজেন্ট নিযুক্ত করে, তিনি এদেশ থেকে তসরের চাদর, মৃগনাভি, আফিং, নীল প্রভৃতি বিলেতে রপ্তানি করতে লাগলেন। প্রখর ব্যবসায়বুদ্ধি, সেইরকম উদ্যোগী। অবশ্যই ভাগ্যবান। একটি উদাহরণ, নিলামে পঁচিশ হাজার টাকার আফিং কিনে সেইদিনেই পঁচাত্তর হাজার টাকায় বিক্রি করে দিলেন। একদিনে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ। ক্রমশ, ক্রমশ ধন, জন, বিত্তবৈভব বাড়ছে। সকলেরই প্রত্যয়, ঘরে এসেছেন লক্ষ্মী। নাম তাঁর রাসমণি। রাজচন্দ্রের সুযোগ্য সহধর্মিণী।

পিতার পরলোকগমনের বছরেই রাসমণি পেলেন তাঁর তৃতীয়কন্যা করুণাময়ীকে। পরের বছরই বড়ো মেয়ের বিবাহ দিলেন। জানবাজারের এই মহৎ পরিবার ক্রমশই এক অদৃশ্য ঐতিহাসিক ভবিষ্যতের দিকে চলেছে। সেখানে অর্থের সঙ্গে ধর্মের মহামিলন ঘটাবেন রানি রাসমণি। ১৮১৯ সালে রাসমণি একটি পুত্রসন্তান পেলেন, কিন্তু মৃত। চারবছর পরে এল কনিষ্ঠকন্যা জগদম্বা। পরবর্তীকালে এঁর ভূমিকাও ইতিহাসে চিহ্নিত হবে।

১৮৩১ সালে তৃতীয়কন্যা করুণাময়ী পরলোকগমন করলেন। রেখে গেলেন স্বামী মথুরামোহন বিশ্বাস ও একমাত্র পুত্র ভূপালচন্দ্রকে। এই মথুরামোহনও একদিন ইতিহাস হবেন। সেইদিন আসন্ন। ভবিষ্যতের সাজঘরে চরিত্ররা প্রস্তুত হচ্ছেন। সেই কারণেই মথুরামোহন জানবাজার থেকে মুক্তি পেলেন না। ১৮৩৩ সালে রাজচন্দ্র কনিষ্ঠ কন্যা জগদম্বার সঙ্গে মথুরামোহনের বিবাহ দিলেন। এই মানুষটি নব্য বাংলার আলোকপ্রাপ্ত এক চরিত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত।

রাজচন্দ্রের অনেক অবদান। প্রচুর উপার্জন, বিষয় সম্পত্তি, প্রচুর দান ধ্যান, সৎকার্যে অর্থব্যয়। তিনি দশ-বারোজন ছাত্রের সমস্ত খরচ চালাতেন। তাঁর দাম্পত্যজীবনে এসেছিল স্বর্গের সুখ, শান্তি ও পূর্ণতা। স্ত্রীর অনুরোধে কলকাতার গঙ্গায় নির্মাণ করিয়ে দিলেন সুন্দর এক স্নানঘাট, যা আজ 'বাবুঘাট' নামে বিখ্যাত। দু'বছরের মধ্যে তৈরি করে দিলেন ঘাটে যাওয়ার সুন্দর একটি রাস্তা। পর পর হতে লাগল আরো জনহিতকর কাজ, বেলেঘাটার খাল খনন, নিমতলার পুরোনো ঘাট ও মুমূর্ষুনিবাস নির্মাণ, আহিরীটোলার ঘাট তৈরি, মেটকাফ হলে অর্থ সাহায্য, হিন্দু কলেজে ও দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে দান ইত্যাদি জনহিতকর কাজের জন্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮৩৩ সালে রাজচন্দ্রকে 'রায়' উপাধি দিলেন। কিন্তু আর মাত্র তিনবছর। এই ব্রতধারী, কর্মময়, বদান্য সমাজসেবী মানুষটি পৃথিবীকে বিদায় জানাবেন ১৮৩৬ সালে মাত্র তিপান্ন বছর বয়সে। আর কি আশ্চর্য, ওই বছরই কামারপুকুরে এলেন গদাধর চট্টোপাধ্যায়, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ।

এইবার প্রকাশিত হলো রাসমণির ব্যক্তিত্ব। শুধু জানবাজারে নয়, সমগ্র বঙ্গে শুরু হলো 'রাসমণি যুগ'। সেইকালে স্বামীর পারলৌকিক শ্রাদ্ধে খরচ করলেন ৫৫ হাজার টাকা। তারপর বিপুল সম্পত্তির দায়িত্বভার তুলে নিলেন নিজের হাতে। অনেকেরই সন্দেহ, তিনি কি পারবেন! দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বিপুল জমিদারির রক্ষণাবেক্ষণ। একদিকে দুষ্ট জমিদারদের অভাব নেই, তাদের লেঠেল, খুনির দল, চোর-ডাকাত, দস্যু, ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী, অত্যাচারী ইংরেজ নীলকরেরা, সমাজের অজস্র সমস্যা, কৃষকদের শোচনীয় দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, বন্যা। বিপন্ন বাংলা, বিপন্ন বাঙালি। নারীদের অবস্থা আরো শোচনীয়। পুরুষশাসিত সমাজে তারা অর্ধমৃত। বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, সতীদাহ।

রাসমণির বিচক্ষণতা, ক্ষাত্রতেজ, দুর্দান্ত সাহস, কূটনৈতিক বুদ্ধি অচিরেই ঝলসে উঠবে। রাজচন্দ্র তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু প্রিন্স দ্বারকানাথকে তাঁর বিশেষ প্রয়োজনে দু'লক্ষ টাকা ধার হিসেবে দিয়েছিলেন। দ্বারকানাথ সেই ধার শোধ করতে পারেননি। দ্বারকানাথ রানিমা'র কাছে এসেছেন। নানা কথার পর বললেন, 'তোমার এখন একজন ম্যানেজারের প্রয়োজন।'

পর্দার আড়ালে বসে রানিমা মথুরামোহনের মাধ্যমে দ্বারকানাথের সঙ্গে কথা আদান-প্রদান করছেন। রানিমা বললেন, 'রাখলে ভালো হয় ঠিকই কিন্তু তেমন বিশ্বাসী মানুষ পাব কোথায়?'

দ্বারকানাথ বললেন, 'তেমন হলে আমি তো আছি।'

ভয়ডরশূন্য রানিমা এইবার স্পষ্ট বললেন, 'সে তো খুব ভালো কথা, তবে আমি এখনো জানতে পারিনি যে, আমার স্বামীর কার কার কাছে কত টাকা পাওনা আছে। তবে আমার স্বামী আপনাকে যে দু-লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছিলেন, সেই টাকাটা যদি আপনি আমাকে এখন ফেরত দিতেন, তবে আমার বিশেষ উপকার হতো।'

সম্ভ্রান্ত দ্বারকানাথ স্তম্ভিত। তিনি যা ভেবেছিলেন এই পর্দানসীন মহিলা তো তা নয়। এঁর যে দেখি অসীম শক্তি। স্পষ্টবক্তা, দুর্দান্ত সাহসী। যেন বজ্র! দ্বারকানাথ খুবই বিব্রত বোধ করলেন। নগদ দু-লক্ষ টাকা তাঁর পক্ষে তখনই দেওয়া সম্ভব ছিল না। রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত তাঁর স্বরূপপুর পরগনাটি তিনি রাসমণির নামে লিখে দিলেন। সেইসময় এই পরগনার বার্ষিক আয় ছিল ৩৬ হাজার টাকা।

দ্বারকানাথ সেইসময় তাঁর নানা ব্যবসাপ্রচেষ্টায় মার খাচ্ছেন একের পর এক। বড়ো বড়ো সব ব্যাপার। তিনি আবার রানিমা'র কাছে ম্যানেজার হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রাসমণি জামাতা মথুরামোহনের মাধ্যমে জানালেন, 'আমি এক সামান্য বিধবা, আমার এই সামান্য বিষয়সম্পত্তি, আপনার মতো যোগ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধান করতে বলাটা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। আমার পুত্রস্থানীয় ভাবী উত্তরাধিকারী জামাতারাই এ কাজ পারবে।' দ্বারকানাথ পরে স্বীকার করেছিলেন, 'উত্তম বুঝলাম, এই রানি সামান্যা স্ত্রীলোক নন।'

সেকালের জমিদারদের খুব সুনাম ছিল না। নানা কায়দায় সম্পত্তি বাড়াতেন। নৃশংস পদ্ধতিতে খাজনা উসুল করতেন। রানিমা'র জমিদারির মধ্যে একটি তালুকের নাম ছিল জগন্নাথপুর। তালুকটির চারদিকেই নড়াইলের জমিদারের জমিদারি। সেইসময় নড়াইলের জমিদার, রামরতন রায়। তাঁর প্রবল ইচ্ছা, রাসমণির এই তালুকটি তিনি গ্রাস করবেন। তাঁর সুপরিকল্পিত অত্যাচারে জগন্নাথপুরের প্রজারা অতিষ্ঠ। লুটপাট, গৃহদাহ, নরহত্যা। আতঙ্ক সৃষ্টি করে রাসমণির ওই তালুকের প্রজাদের নিজের বশে আনার চেষ্টা। রানির প্রচণ্ড প্রতাপের কাছে তাঁকে হার স্বীকার করতে হলো। প্রজাদের ওপর অত্যাচার রানি সহ্য করতে পারবেন কী করে? তিনি যে তাদের মা। তাঁর আদেশে 'মহাবীর' নামে এক সর্দারের নেতৃত্বে একদল লাঠিয়াল এল জগন্নাথপুরে প্রজাদের রক্ষার

জন্যে। মহাবীর মথুরবাবুর অত্যন্ত প্রিয় লাঠিয়াল। গম্ভীর প্রকৃতির, শক্তিশালী, সদাশয়। মহাবীরের আগমনে রামতরনের লেঠেলরা প্রথমে একটু পিছিয়ে গেলেও, পেছন থেকে অতর্কিত ছুরি চালিয়ে মহাবীরকে হত্যা করল।

রামরতন অনুমান করতে পারেননি জানবাজারের রানির শক্তি ও দৃঢ়তা কতটা। মহাবীরের হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, হুগলি ও অন্যান্য জায়গা থেকে রানিমা বেছে বেছে লাঠিয়াল, পাইক, সড়কিওয়ালা প্রভৃতি সংগ্রহ করলেন। নেতৃত্বে জগন্নাথপুরের নায়েব। ওদিকে জমিদার রামরতন রায়ও দাঙ্গার জন্যে প্রস্তুত। রানিমার বাহিনীর কৃষ্ণকায় ভীষণাকার বলশালী যোদ্ধারা টাঙ্গি, বল্লম, বর্শা, লাঠি, সড়কি, কুঠার ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, 'জয় মায়ের জয়', 'জয় রানি রাসমণির জয়' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত। ওদিকে রানির নামে এই ভীষণ হুঙ্কারে বিপক্ষ স্তম্ভিত। রানিমায়ের নামমাহাত্ম্যেই দাঙ্গা আর হলো না। বহু লোকের প্রাণ বাঁচল।

এখনো হয়নি। রামরতনের এখনো কিছু পাওয়া বাকি আছে। রানিমা প্রতাপশালী এই জমিদারটির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু করলেন। হার হলো রামরতনের। প্রজারা সুরক্ষিত হলেন। তাঁর জমিদারির মকিমপুর পরগনায় নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচার শুরু হলো। অভাবনীয় অত্যাচারে পল্লিজীবন ছারখার। চাষের জমিতে ধানের পরিবর্তে গায়ের জোরে নীল বুনতে বাধ্য করা। ইংরেজের আদালতে ইংরেজদের সাতখুন মাপ। মকিমপুরে সবচেয়ে অত্যাচারী নীলকরের নাম ডোনাল্ড। একে টিট করার দাওয়াই লাঠি। আদালত কিছু করবে না। রানিমার লাঠিয়ালরা এসে ডোনাল্ডকে পিটিয়ে আধমরা করে দিলে। সাহেবরা আদালতে গেলেন। সুবিধে করতে পারলেন না। মামলা খারিজ হয়ে গেল। রানিমা তাঁর এলাকা থেকে সব নীলকরদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন। কর্মচারীদের আদেশ দিলেন — কোনো চাষিই যেন কোনো কারণে কোনো সাহেবের কাছে জমি বিক্রি না করে।

পরে যা বিদ্রোহের আকার নেবে, 'বঙ্গে নীল বিদ্রোহ', তার সূচনা করেছিলেন বাংলার রানি রাসমণি। ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে তাঁর লাগাতার 'আইনি সংগ্রাম'। প্রজাস্বার্থবিরোধী কিছু করলেই প্রজারা দেখতেন, রানি তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে রক্ষাকর্ত্রী। গঙ্গায় জেলেরা মাছ ধরতে চাইলে 'জলকর' দিতে হবে। প্রথমে দরিদ্র মৎস্যজীবীরা প্রতিকারের জন্য শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাহায্য চাইলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর। কিন্তু প্রবলপ্রতাপ ইংরেজ সরকারকে ঘাঁটাবার সাহস কারো হলো না। তখন তাঁরা ভাবলেন, এই বিপদে আমাদের একজনই আছেন — রানিমা।

এবার আর লাঠি নয়, বুদ্ধি। রানিমা সরকারের কাছ থেকে জেলেরা গঙ্গার যে অংশে মাছ ধরে অর্থাৎ হাওড়ার ঘুসুড়ি থেকে মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত, দশ হাজার টাকায় ইজারা নিলেন। ইংরেজ সরকার টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। রানি রাসমণি টাকা দিয়েছেন। গঙ্গালিজ মঞ্জুর। এইবার আসল খেলা। রানিমা তাঁর কর্মচারীদের আদেশ দিলেন, লিজে নেওয়া গঙ্গার অংশটা এপাশে ওপাশে লোহার মোটা চেন দিয়ে ঘিরে দাও। ওই অংশটুকু আমার। গঙ্গাবন্ধনে সরকারের টনক নড়ল। জাহাজ, নৌকা চলাচল বন্ধ। রানিমা'র কৃপায় জেলেরা মনের আনন্দে মাছ ধরছেন।

সরকারের দপ্তর থেকে নোটিস এল, জলপথ কেন বন্ধ করা হয়েছে? কারণ দর্শাও। মাল চলাচলের অসুবিধে করে বাণিজ্যিক ক্ষতিসাধন করা অপরাধ বলে গণ্য হবে না কেন? রানিমার ভয়ডর নেই। লড়াই

করছেন সসাগরা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে। বুদ্ধির প্যাঁচ। নোটিস পেয়েও গঙ্গার চেন খুললেন না। সরকারকে জানালেন, 'আমি নির্ধারিত কর দিয়ে গঙ্গা জমা নিয়েছি, অতএব আইনত আমি ঐ পথ বন্ধ করতে পারি। আমার প্রজাদের অসুবিধা হচ্ছে। এই অংশে অনবরত জাহাজ চলাচল করলে, এবং কলকাতার বন্দরে জাহাজের ঘাঁটি হলে, এখানে গঙ্গায় জাহাজের শব্দের ভয়ে মাছ থাকবে না। প্রজাদের এই ক্ষতি এড়াবার জন্যই আমি এখানে জাহাজ আসতে দিতে পারি না।'

এই অকাট্য যুক্তির কোনো উত্তর সরকারের মাথা থেকে বেরলো না। তখন আপস। রানিমা বললেন, 'গঙ্গা জমা নেওয়ার ইচ্ছা আমার আদৌ নেই। আমি শুধু গরিব জেলেদের মুখ চেয়েই এটি জমা নিয়ে কোনো কর ছাড়াই তাদের মাছ ধরতে দিতাম। সরকার যদি আগেকার মতো কর ছাড়াই আবার জেলেদের মাছ ধরতে দেন, তাহলে আমি পথ খুলে দিতে রাজি আছি।'

প্যাঁচে পড়ে সরকার 'জল কর' তুলে দিতে বাধ্য হলেন। রানিমার লিজের পুরো টাকা ফিরিয়ে দিলেন। গঙ্গা বন্ধন মুক্ত হলো। জেলেরা পেলেন করমুক্ত মাছ ধরার অধিকার, আজও যা বহাল আছে। সারা বাংলায় রানিমার নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। সকলের মুখে মুখে একটি গান —

'ধন্য রানি রাসমণি রমণীর মণি।
বাংলায় ভালো যশ রাখিলে আপনি।।
দীনের দুঃখ দেখে কাঁদিলে আপনি।
দিয়ে ঘরের টাকা পরের জন্যে বাঁচালে প্রাণী।
যে যশ রাখিলে তুমি হইয়ে রমণী।
ঘরে ঘরে তোমার নাম গাইল দিবস রজনি।।'

জানবাজারের বিশাল সাতমহলা বাড়িতে খুব ঘটার দুর্গাপূজা। জানবাজার থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত রাস্তাটি রাজচন্দ্রই করিয়েছিলেন। জানবাজারের সম্পত্তি। সপ্তমীর সকালে ঢাকঢোল-সহযোগে পুরোহিতরা ওই পথ দিয়ে নবপত্রিকা স্নান করাতে নিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তার পাশের একটি বাড়িতে এক সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি চিৎকার করছেন, 'স্টপ ইট, স্টপ ইট।' রানিমা এই প্রতিবাদে আদৌ বিচলিত না হয়ে নির্দেশ দিলেন, আমাদের ধর্ম, আমাদের বিধান। ধর্মে সাহেবি হস্তক্ষেপ! যা হচ্ছে তাই হবে, আরো বেশি হবে। তিনদিন ওই রাস্তায় ভোরবেলা প্রবল সোরগোল। আরো জোরে জোরে বাদ্যবাজনা। অপমানিত সাহেব রাসমণির বিরুদ্ধে মামলা করলেন। আদালতে রানিমা'র উকিল পেশ করলেন দলিল। গ্যারিসন অফিসারের মঞ্জুর করা দলিল। রাজচন্দ্র দাসকে রাস্তা করার জন্যে আর্মি ওই জমি দিয়েছিলেন। রাসমণি বলে পাঠালেন, 'আমার খাসের রাস্তা, আমার যা ইচ্ছা, আমি তাই করব। সরকার বাধা দিলে যে খরচে রাস্তা করিয়েছি তার দ্বিগুণ খরচে রাস্তা উচ্ছেদ করব।' তবুও সরকারি আদেশ অমান্য করার অপরাধে ৫০ টাকা জরিমানা।

রানিমা জরিমানা জমা দিলেন, তারপর, বড়ো বড়ো, মোটা মোটা গরান কাঠ দিয়ে জানবাজারের বাড়ি থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত পুরো রাস্তার দুধার দৃঢ়ভাবে বেড়া দিয়ে আটকে দিলেন। অন্য রাস্তার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ। কি হচ্ছে বোঝার আগেই কাজ শেষ। রানিমার কর্মীরা এতটাই তৎপর, এবং তাঁদের সংখ্যা। ইংরেজ সরকার এইবার কী করবে করো। ইংরেজি ভাষারই প্রবাদ — 'টিট্ ফর ট্যাট্'। প্রথমে এল কড়া আদেশ, 'রাস্তা

খুলে দাও।' কড়া উত্তর, 'জায়গাটা আমাদের, রাস্তাটাও আমাদের তৈরি, বেড়াটাও আমাদের, সরকারের আপত্তির কোনো কারণ থাকতে পারে না। তবে আমার রাস্তা যদি সরকারের প্রয়োজন হয়, আমাকে উচিত মূল্য দিলে রাস্তা খুলে দোবো, নচেৎ নয়।'

সরকারের হম্বিতম্বি চুপসে গেল। এইবার অনুরোধ না চাইতেই জরিমানার টাকাও ফেরত এল। সরকার বুঝে গেলেন, এই নারীর শক্তি ও বুদ্ধিকে সমীহ করে চলতে হবে। একাই একশো। এঁর কাছে বারেবারে পরাজয়। রানি বাবুঘাটের রাস্তা নিজের খাসে রেখেও সাধারণের ব্যবহারের জন্যে বেড়া খুলে দিলেন। আবার তাঁর জয়জয়কার। তাঁর নামে এই ছড়াটি লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল —

'অষ্ট ঘোড়ার গাড়ি দৌড়ায় রানি রাসমণি।

রাস্তা বন্ধ করতে পারলে না কোম্পানি।।'

১৮৫৭ সাল। সিপাহি বিদ্রোহের কাল। ইংরেজদের নড়েচড়ে বসার কাল। বড়োসড়ো এক ধাক্কা। রানিমা রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি খুব ভালো বুঝতেন। তিনি জানতেন এদেশ থেকে ইংরেজদের সহজে হটানো যাবে না। তাদের রাজবুদ্ধি প্রবল। ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ ব্যারাকপুরে ক্যান্টনমেন্টে সিপাহি মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহ সারা ভারতে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল। বহু ক্ষয়ক্ষতি, মৃত্যু, দমন-পীড়ন। এই সময় অনেকেই কোম্পানির কাগজ (শেয়ার) বিক্রি করে দিতে লাগলেন; কারণ ইংরেজ কোম্পানির আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। রানিমার পরামর্শদাতারা বললেন আপনিও এইবেলা সব শেয়ার বিক্রি করে দিন। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্না রাসমণির বদ্ধমূল ধারণা ছিল, এই বিক্ষিপ্ত এবং ধর্মীয় বিভ্রান্তিকর বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ কোনোমতেই ভারত ত্যাগ করে চলে যাবে না।

রানিমার ভবিষ্যৎ দর্শন সত্য হলো। বিদ্রোহ স্তিমিত হলো। কোম্পানির আমল শেষ হলো। ১৮৫৮ সাল ইংল্যান্ডেশ্বরী মহারানি ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করলেন। ব্রিটিশ রাজত্ব কায়েম হলো। সমগ্র ভারতে কড়া শাসন। দেশের স্থানে স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে গোরা সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। এইরকম একটি সেনা ব্যারাক হলো রানিমার বাড়ির কাছে ফ্রিস্কুল স্ট্রিটে। সৈন্যসংখ্যা প্রায় ২০০/২৫০। বেশিরভাগই অশিক্ষিত, দুর্ধর্ষ, অবাধ্য। মাথার ওপর একজন মাত্র অধিনায়ক — Officer Commanding। বিদ্রোহ শেষ। কিছুই যখন করার নেই এই দুশো, আড়াইশো বন্দুকধারী কী করবে? মাতাল অবস্থায় প্রকাশ্য রাজপথে লোকজনের ওপর অত্যাচার, কখনো কখনো দোকানে, দোকানে, বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে অবাধ লুটপাট।

ঘটনাটা ঘটল এক সন্ধ্যায়। কয়েকজন মাতাল সৈন্য জানবাজারের পথে রানিমা'র বাড়ির সামনে এক নিরীহ পথচারীর ওপর অকারণে বলপ্রয়োগ করছিল। রাসমণিদেবীর দারোয়ানেরা তাদের বাধা দেয়। তারা তখন জোর করে রানিমার প্রাসাদে ঢোকার চেষ্টা করলে, দারোয়ানরা তাদের মেরে তাড়িয়ে দেয়। একজন গোরা সৈন্যের মাথাও ফাটে। তারা এইবার ঘাঁটিতে গিয়ে প্রায় ৫০/৬০ জন উন্মত্ত সেনাকে নিয়ে ফিরে এল। হাতে খোলা তরোয়াল। শুরু হলো তাণ্ডব। দারোয়ানেরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তরোয়ালের আঘাতে দুজনের প্রাণ গেল। বাড়িতে সেই সময় পুরুষরা কেউ নেই।

গোরাদের তাণ্ডবের খবর পেয়ে রাসমণিদেবী বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ির মেয়েদের ও শিশুদের মান্নাবাবুদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। এইবার নিজে ধরলেন রণরঙ্গিণীর মূর্তি। হাতে ঝলসাচ্ছে খোলা

তরোয়াল। অন্দরমহলের গৃহদেবতা রঘুনাথজির মন্দিরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। গৃহদেবতাকে জীবন বিসর্জন দিয়ে রক্ষা করবেন।

ওদিকে ভাঙচুর, লুটপাট চলেছে। বাড়ির পোষা পাখিগুলোকেও কেটে টুকরো টুকরো করেছে। বিশ্বস্ত ভৃত্য গোবিন্দের কোমরে তরোয়ালের কোপ মেরেছে। সে সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে পড়ে আছে। এরপর গোরা সৈন্যরা রাসমণিদেবীর ভৈরবী মূর্তির মুখোমুখি। কেউ কেউ মন্দিরের দিকে এগোবার চেষ্টা করলে রাসমণিদেবীর তরোয়ালের আঘাতে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

এর পরে রাত দশটা নাগাদ জামাতা মথুরামোহন বাড়ি ফিরে এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড দেখে স্থানীয় কলিঙ্গবাজারে গিয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে গোরাদের ফ্রিস্কুল স্ট্রিটের ডেরায় হাজির হলেন। তাদের অধিনায়ক ও আরো কিছু সৈনিককে নিয়ে জানবাজারের বাড়িতে এলেন। কম্যান্ডিং অফিসারের হুঙ্কারে সব শান্ত হলো। রাসমণিদেবী সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করলেন।

এক জীবনে এত সৎকর্ম! বহুবিবাহ সেকালের সামাজিক ব্যাধি। এই কুলীন প্রথা বন্ধের জন্যে আন্দোলন চলছিল। রাসমণিদেবী এই আন্দোলনের পক্ষে তৎকালীন ব্যবস্থাপক সমাজে বহুবিবাহ রোধের একটি আবেদনপত্র পেশ করেন। তাঁর জনকল্যাণমূলক কাজের তালিকা দীর্ঘ। যেমন, সুবর্ণরেখা নদীর পরপার থেকে বহু অর্থব্যয়ে তীর্থযাত্রীদের জন্যে পুরী পর্যন্ত প্রশস্ত পথ তৈরি, জন্মস্থান কোনা গ্রামে একটি স্নানঘাট নির্মাণ, নিমতলা মহাশ্মশানে গঙ্গাযাত্রীদের জন্যে বহু টাকায় প্রাসাদতুল্য ঘাট নির্মাণ। আরো অনেক ঘাট — কালীঘাটের আদি গঙ্গায়, বাবুগঞ্জ। 'টোনার খাল' খনন করিয়ে মধুমতী নদীর সঙ্গে গঙ্গার সংযোগসাধন। বেলিয়াঘাটা ও ভবানীপুরে বাজার স্থাপন। বিভিন্ন কলেজে অর্থ সাহায্য।

সব কাজের সেরা কাজ, তিনি মন্দির হয়ে গেলেন। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির। যে উদ্যানে ঘটবে বাংলার নবজাগরণ। সেই ভাবান্দোলনের প্রবাহ ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র বিশ্বে। কালের ইতিহাসে তাঁর নাম জ্বলজ্বল করবে। ১৮৪৭ সাল, তিনি কাশী যাবেন। নৌবহর প্রস্তুত। তিনি স্বপ্নাদেশ পেলেন। কাশীতে কাশী থাক, এই গঙ্গার তীরে আমি তোমার পূজা নেবো। বারাণসী যাওয়ার জন্যে কলকাতার ঘাটে পঁচিশটি বজরা সুসজ্জিত ছিল। সেইসময় বঙ্গদেশে ঘোর দুর্ভিক্ষ ও মহামারির কবলে। রানিমার আদেশে বজরায় মজুত সমস্ত খাদ্য-দ্রব্য দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হলো।

রাসমণিদেবী জামাতা মথুরামোহনকে স্থান নির্বাচন ও দেবালয় নির্মাণের ভার অর্পণ করলেন। জমি পাওয়া গেল দক্ষিণেশ্বরে ভাগীরথী তীরে। সেখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বারুদাগারের দক্ষিণে, কলকাতা সুপ্রিমকোর্টের এটর্নি জেমস হেস্টি সাহেবের দোতলা কুঠিবাড়িসমেত সাড়ে চুয়ান্ন বিঘা জমি ছিল। ৪২ হাজার ৫০০ টাকায় এই সম্পত্তি কেনা হলো। পূর্বদিকে কাশীনাথ চৌধুরিদের জমি, পশ্চিমে গঙ্গা, উত্তরে সরকারি বারুদখানা, দক্ষিণে জেমস হেস্টির কারখানা। এই বিশাল উদ্যানটির পূর্ব মালিক ছিলেন জন হেস্টি। নাম ছিল 'সাহেবান বাগিচা'। তিনি কুঠিবাড়িতে বাস করতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, এখানে একটি চটকল করবেন। কলের

যন্ত্রপাতি কেনার জন্য বিলেত যাওয়ার পথে জাহাজেই তাঁর মৃত্যু হলো। জেমস হেস্টি তাঁর এটর্নি। রানীমা তাঁর কাছ থেকেই এই সম্পত্তি কিনলেন। মুসলমানদের কবরডাঙ্গা, গাজিপিরের স্থান, পুষ্করিণী, আমবাগান সবই ঢুকে গেল রানিমার সম্পত্তির মধ্যে। জমিটি 'কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি'। শাস্ত্রমতে শক্তিমন্দির প্রতিষ্ঠার সর্বোত্তম স্থান।

এই বিরাট বিষয়টি কেনা হলো ১৮৪৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর। সেই বছরেই শুরু হলো মন্দির নির্মার্ণের কাজ দায়িত্বে তৎকালের নামকরা বিলিতি ঠিকাদারি সংস্থা 'ম্যাকিনটস অ্যান্ড বার্ন'। এই মন্দির নির্মাণে সময় লেগেছিল ৭/৮ বছর। নির্মাণকাজ শেষ হলো ১৮৫৪ সালে। অনেক শাস্ত্রীয় বাধা বেরিয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা হলো ১৮৫৫ সালের ৩১মে (১২৬২ বঙ্গাব্দ ১৮ জৈষ্ঠ্য, স্নান যাত্রার দিন)। বিরাট, বিপুল, অভাবনীয় সমারোহ। অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, মূলাজোড়, নোয়াখালি, বিক্রমপুর, চট্টগ্রাম, কাশী, পুরী, পুনা, মাদ্রাজ, কনৌজ, মিথিলা থেকে লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ এসেছিলেন।

দেবীকে অন্নভোগ দেওয়া যাবে না, কারণ রাসমণি ব্রাহ্মণ নন — এই ছিল সেকালের হিন্দুশাস্ত্রের ফরমান। স্বপ্নাদিষ্ট রানিমাতা এই বিধান মানবেন কেন? মন্দির নির্মাণের শুরুর দিন থেকে তিনি ব্রতধারী। তাপসীর জীবন ধারণ করেছেন। কঠোর নিয়মে-নিষ্ঠায় নিজেকে বেঁধেছেন। শেষমুহূর্তে সমাধানের পথ বের করে দিলেন কামারপুকুরের পণ্ডিত রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। প্রতিষ্ঠার দিন রামকুমারই দেবীকে অন্নভোগ নিবেদন করলেন। রানি রাসমণি মহানন্দে, পরম উৎসাহে 'অন্নদানযজ্ঞ' করলেন। সেই আয়োজন কেউ কখনো শোনেনি, দেখা তো দূরের কথা। যেমন, দধি-পুষ্করিণী, পায়েস-সমুদ্র, ক্ষীরহ্রদ, দুগ্ধ-সাগর, তৈল-সরোবর, ঘৃত-কূপ, লুচি-পাহাড়, মিষ্টান্ন-স্তূপ, কদলীপত্র-রাশি, মৃন্ময়পাত্র-স্তূপ। সেই কালে মোট ন'লক্ষ টাকা খরচ হলো।

মন্দির প্রতিষ্ঠার আগের দিন থেকেই শুরু হয়েছিল নানা উৎসব — যাত্রা, কালীকীর্তন, ভাগবতপাঠ, রামায়ণ গান। উৎসবের দিন দাদা রামকুমারের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে উৎসব-রাত্রির বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, বিরামহীন আনন্দ। অসংখ্য আলোকমালায় দেবালয়ের সর্বত্র দিনের মতো উজ্জ্বল, রানি যেন রজতগিরি তুলে এনে এখানে বসিয়ে দিয়েছেন।

এই মন্দির, মন্দির সংলগ্ন উদ্যানের পঞ্চবটীতে শুরু হবে আর কয়েকদিন পরেই শ্রীরামকৃষ্ণের যুগান্তকারী সাধনা, 'যত মত তত পথ'। ইংরিজি শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত উচ্চবংশীয় একদল যুবক সাধক, অবতার পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই দেবালয়ে আসবেন। এই তপোভূমি থেকেই উদিত হবেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা করবেন ভারতধর্ম। প্রবক্তা যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। এই মন্দির সব কর্মকাণ্ডকে ম্লান করে দিয়ে হয়ে উঠবে অনির্বাণ এক শিখা। দক্ষিণেশ্বর, মা কালী, রানি রাসমণি, মথুরামোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ এক অদ্ভুত সংযোগ। কি না হবে এই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে! রানিমাতার অন্যতম জীবনীকার শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমচন্দ্র সেন লিখলেন, 'দক্ষিণেশ্বর নিত্যতীর্থ, ব্যক্ততীর্থ, শুধু ভারতের নয়, জগতের মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে। লোকমাতা শ্রীশ্রীরানি রাসমণি ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব যুগান্তকারী ব্যাপার। রানিমা যুগদেবীস্বরূপে

ও ঠাকুর যুগাবতার-স্বরূপে আসিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে উভয়েই দিব্যলীলার মাধুর্য প্রকট করিলেন... ঠাকুর বলিতেন রানিমা বিশ্বজননী জগদম্বা। ধরাধামে তাঁহার লীলা বিস্তার করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এস্টেটের পক্ষে গোপীনাথ দাস লিখছেন, 'দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকেই রানি বিশেষভাবে ধর্ম-কর্ম ও পূজার্চনা নিয়েই দিন কাটাতেন। জমিদারি দেখাশোনার ভার জামাতাদের। জানবাজারের বাড়িতে বেশি থাকতেন না। অধিকাংশ সময়েই কখনো একা, কখনো বা সপরিবারে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরেই কাটাতেন।

'দাদার পরলোকগমনের পর (তিনি মাত্র এগারো মাস এই নতুন মন্দিরে পুজারির দায়িত্ব সামলেছিলেন) রামকৃষ্ণদেব পূজারি হলেও রানিমা রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে অসাধারণ ধর্মভাব দেখে তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করতেন, নিকটে বসে ধর্মকথা শুনতেন। অনেক সময় আবার রামকৃষ্ণদেবের মুখে ভজন ও অন্যান্য ধর্মসংগীত শুনতেন। রামকৃষ্ণদেব রানির মধ্যে অপরিসীম ধর্মভাব দেখে তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বলতেন, 'রানিমা দেবীর অষ্ট সখীর একজন।'

জমজমাট একটি জীবন। কর্মে, ধর্মে, সেবায়, জনহিতে সম্পূর্ণ নিবেদিত এক প্রাণ। এইবার বুঝি যাওয়ার সময় হলো। সবটা দেখা হলো না। দক্ষিণেশ্বর রইল, রইলেন মা ভবতারিণী তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে, রইল রূপোর রথ, সবই হবে যেমন হতো দোল দুর্গোৎসব। থাকবেন না রানি রাসমণি। ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ সাল (১২৬৭ বঙ্গাব্দ, ৯ ফাল্গুন), রাত্রে কালীঘাটের বাগানবাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, 'কালীপদ অভিলাষী শ্রীরাষমণি দাসি'। এই ছিল তাঁর সিলমোহর — RAUS MONEY DOSSI/কালীপদ অভিলাষী শ্রীরাষমণী দাসি।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৬) : একালের বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক। শৈশব কেটেছে ছোটনাগপুরের নির্জন পাহাড়ি অঞ্চলে। কিছুদিন রামকৃষ্ণ মিশনের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। সরকারি চাকরিতেও ছিলেন কিছুকাল। তারপর পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন সাংবাদিকতাকে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'সারি সারি মুখ'। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইগুলির মধ্যে রয়েছে— 'জীবিকার সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গ', 'শ্বেতপাথরের টেবিল', 'পায়রা', 'সোফা-কাম-বেড', 'শাখা-প্রশাখা', 'তৃতীয় ব্যক্তি', 'শঙ্খচিল', 'বুদবুদ', 'অবশেষ', 'দুই-মামা', 'নবেন্দুর দলবল', 'মনোময়', 'অজ্ঞাতবাস', 'ইতি পলাশ', 'ইতি তোমার মা', 'কলকাতার নিশাচর', 'ডোরাকাটা জামা', 'বুকুসুকু', 'শিউলি' প্রভৃতি। 'গিরিশচন্দ্রের শ্রীরামকৃষ্ণ', 'দীনজনে', 'পরমপদকমলে', 'শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ চরণকমলে' প্রভৃতি তাঁর লেখা ভিন্নস্বাদের কয়েকটি বই।

হারিয়ে যাওয়া কালি কলম

শ্রীপান্থ

কথায় বলে— কালি কলম মন, লেখে তিন জন। কিন্তু কলম কোথায়? আমি যেখানে কাজ করি সেটা লেখালেখির আপিস। সবাই এখানে লেখক। কিন্তু আমি ছাড়া কারও হাতে কলম নেই। সকলের সামনেই চৌকো আয়নার মতো একটা কাচের স্ক্রিন বা পরদা। আর তার নীচে টাইপরাইটারদের মতো একটা কি-বোর্ড। প্রতিটি বোতামে ছাপা রয়েছে একটি করে হরফ। লেখকরা অনবরত তা দিয়ে লিখে চলেছেন, মাঝে মাঝে লেখা থামিয়ে তাকাচ্ছেন সেই পরদার দিকে। যা ইতিমধ্যে লেখা হয়েছে তা-ই ফুটে উঠেছে পরদায়। আমি যা লিখি ওঁরা ভালোবেসে আমার লেখাকেও এভাবে ছাপার জন্য তৈরি করে দেন। একদিন যদি কোনও কারণে কলম নিয়ে যেতে ভুলে যাই তবেই বিপদ।—কলম! কারও সঙ্গে কলম নেই। যদি বা কারও কাছে গলা-শুকনো ভোঁতা-মুখ একখানা জোটে, তবে তাতে লিখে আমার সুখ নেই। দায়সারা ভাবে কোনও মতে সেদিনকার মতো কাজ সারতে হয়। অথচ আমাদের আপিস, সবাই বলেন, লেখালেখির অফিস। লেখকের কারখানা। বাংলায় একটা কথা চালু ছিল, ‘কালি নেই, কলম নেই, বলে আমি মুনশি’! কালগুণে বুঝিবা আজ আমরাও তা-ই।

আমি গ্রামের ছেলে। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে আমার মতো যাঁরা বাংলার অজ-পাড়া-গাঁয়ে জন্মেছেন তাঁরা হয়তো বুঝবেন কলমের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক। আমরা কলম তৈরি করতাম রোগা বাঁশের কঞ্চি কেটে। মুশকিল হতো কলমের মুখটি চিরে দেওয়ার সময়। বড়োরা শিখিয়ে দিয়েছিলেন, কলম শুধু সুঁচলো হলে চলবে না, কালি যাতে এক সঙ্গে গড়িয়ে না-পড়ে তার জন্য মুখটা চিরে দেওয়া চাই। তবে কালি পড়বে ধীরে ধীরে চুইয়ে। কোথায় পড়বে? না, লেখার পাতে। লেখার পাত বলতে শৈশবে আমাদের ছিল কলাপাতা। তাই কেটে কাগজের মতো সাইজ করে নিয়ে আমরা তাতে 'হোম-টাস্ক' করতাম। আর সেগুলি বান্ডিল করে নিয়ে যেতাম স্কুলে। মাস্টারমশাই দেখে বুঝে আড়াআড়ি ভাবে একটা টানে তা ছিঁড়ে ফেরত দিতেন পড়ুয়াদের। আমরা ফেরার পথে কোনও পুকুরে তা ফেলে দিয়ে আসতাম। বাইরে ফেললে গোরু খেয়ে নিলে অমঙ্গল। অক্ষরজ্ঞানহীনকে লোকে বলে, ওর কাছে ক'অক্ষর গোমাংস। গোরুকে অক্ষর খাওয়ানোও নাকি পাপ।

আমরা কালিও তৈরি করতাম নিজেরাই। অবশ্য মা পিসি দিদিরাও সাহায্য করতেন। প্রাচীনেরা বলতেন— 'তিল ত্রিফলা সিমুল ছালা/ছাগ দুগ্ধে করি মেলা/লৌহপাত্রে লোহায় ঘসি/ছিঁড়ে পত্র না ছাড়ে মসি।' ভালো কালি তৈরি করতে হলে এই ছিল তাঁদের ব্যবস্থাপত্র। আমরা এত কিছু আয়োজন কোথায় পাব। আমাদের ছিল সহজ কালি তৈরি পদ্ধতি। বাড়ির রান্না হতো কাঠের উনুনে। তাতে কড়াইয়ের তলায় বেশ কালি জমত। লাউপাতা দিয়ে তা ঘষে তুলে একটা পাথরের বাটিতে রাখা জলে তা গুলে নিতে হতো। আমাদের মধ্যে যারা ওস্তাদ তারা ওই কালো জলে হরতকী ঘষত। কখনও কখনও মাকে দিয়ে আতপ চাল ভেজে পুড়িয়ে তা বেটে ওতে মিশাত। সব ভালো করে মেশাবার পর একটা খুন্তির গোড়ার দিকটা পুড়িয়ে লাল টকটক করে সেই জলে ছ্যাঁকা দেওয়া হতো। অল্প জল তো, তাই অনেক সময় টগবগ করে ফুটত। তারপর ন্যাকড়ায় ছেঁকে দোয়াতে ঢেলে কালি। দোয়াত মানে মাটির দোয়াত। বাঁশের কলম, মাটির দোয়াত, ঘরে তৈরি কালি আর কলাপাতা, বলতে গেলে তাই নিয়ে আমাদের প্রথম লেখালেখি। এত বছর পরে সেই কলম যখন হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম, তখন মনে কষ্ট হয় বইকী!

ভাবি, আচ্ছা, আমি যদি জিশু খ্রিস্টের আগে জন্মাতাম! যদি ভারতে জন্ম না হয়ে আমার জন্ম হত প্রাচীন মিশরে? আমি যদি বাঙালি না হয়ে হতাম প্রাচীন সুমেরিয়ান বা ফিনিসিয়ান? তবে হয়তো নীল নদীর তীর থেকে একটা নল-খাগড়া ভেঙে নিয়ে আসতাম, সেটিকে ভোঁতা করে তুলি বানিয়ে লিখতাম। হয়তো সুঁচালো করে কলম বানাতাম। হয়তো ফিনিসীয় আমি, বনপ্রান্ত থেকে কুড়িয়ে নিতাম একটা হাড়— সেই আমার কলম। এমনকী আমি যদি রোম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হতাম, আমি যদি হতাম স্বয়ং জুলিয়াস সিজার, তা হলেও আমার শ্রেষ্ঠ কারিগররা বড়োজোড় একটা ব্রোঞ্জের শলাকা, যার পোশাকি নাম স্টাইলাস, তুলে দিত আমার হাতে, তার বেশি কিছু নয়। সিজার যে কলমটি দিয়ে কাসকাকে আঘাত করেছিলেন সেটি কিন্তু এই স্টাইলাস বা ব্রোঞ্জের ধারালো শলাকা। কলম সেদিন খুনিও হতে পারে বইকী। চিনারা অবশ্য চিরকালই লিখে আসছে তুলিতে। তাদের বাদ দিলে এই সেদিন পর্যন্ত বিশ্বের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা ছিল সর্বার্থেই শলাকা। তা বাঁশের হোক, নল-খাগড়ার হোক, পাখির পালক আর ব্রোঞ্জেরই হোক।

এখন স্কুলের ছেলেমেয়ের তহবিলেও হয়তো দেখা যায় রকমারি কলম। হয়তো গ্রামাঞ্চলেও আজ বাঁশের কঞ্চির কলম আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। খাগের কলম দেখা যায় একমাত্র সরস্বতী পুজোর সময়। কাচের দোয়াতে কালির বদলে দুধ। ফাউন্টেন পেন বা বলপেনের বদলে খাগের কলম। পালকের কলমও আর চোখে

পড়ে না। তার ইংরেজি নাম 'কুইল'। লর্ড কার্জন বাঙালি সাংবাদিকদের গরম গরম ইংরেজি দেখে তাঁদের বলতেন— 'বাবু কুইল ড্রাইভারস'। এখন পালকের কলম দেখতে হলে পুরানো দিনের তৈলচিত্র কিংবা ফটোগ্রাফ ছাড়া গতি নেই।

উইলিয়াম জোন্স কিংবা কেরি সাহেবের স-মুনশি ছবিতে দেখা যায় সামনে তাঁদের দোয়াতে গোঁজা পালকের কলম। এই পালক কেটে কলম তৈরির জন্য সাহেবরা ছোট্ট একটা যন্ত্রও বের করেছিলেন। যন্ত্রটা এক ধরনের পেনসিল সার্পনারের মতো। তাতেও রয়েছে ধারালো ব্লেড। পালক ঢুকিয়ে চাপ দিলেই ব্যস, তৈরি হয়ে গেল কলম।

পালকের কলম তো দূরস্থান, দোয়াত কলমই বা আজ কোথায়! কোনও কোনও আপিসে দেখা যায় টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে দোয়াত কলম। কিন্তু সে সব ফাঁকি মাত্র। ওই কলম দুটি আসলে ছদ্মবেশী বল-পেন মাত্র। তাকে আবার কেউ কেউ বলেন ডট-পেন। কিছুকাল আগে একজন বিদেশি সাংবাদিক লিখেছিলেন কলকাতার চৌরঙ্গির পথে গিজগিজ করছে ফেরিওয়ালা। তাদের প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনের পেশা কলম বিক্রি। এক হাতে দশ কলমধারী ফেরিওয়ালা কিন্তু এখনও দেখা যায়। শস্তার চূড়ান্ত। ফলে প্রত্যেকের পকেটে কলম। শুধু কি পকেটে? পণ্ডিত মশাইয়ের কলম খ্যাত ছিল কানে গুঁজে রাখার জন্য। দার্শনিক তাঁকেই বলি— যিনি কানে কলম গুঁজে দুনিয়া খোঁজেন।

ছেলেবেলায় একজন দারোগাবাবুকে দেখেছিলাম যাঁর কলম ছিল পায়ের মোজায় গোঁজা। আজকাল কোনও কোনও অতি-আধুনিক ছেলেকে দেখি যাদের কলম বুক-পকেটে নয়, কাঁধের ছোট্ট পকেটে সাজানো। কেউ কেউ অবশ্য চুলেও কলম ধারণ করেন। সেটা অবশ্য ইচ্ছাকৃত নয়, ভিড়ের ট্রামে বাসে যাতায়াতের ফল। মহিলা যাত্রী ট্রাম থেকে নামছেন, কে একজন চেঁচিয়ে উঠল,— ও দিদি, আপনার খোঁপায় কলম।

বিস্ফোরণ। কলম বিস্ফোরণ। এক সময় বলা হতো— 'কলমে কায়স্থ চিনি, গোঁফেতে রাজপুত।' এখন কলম বা গোঁফ, কোনও কিছুই আর বিশেষ কারও নয়। 'কালির অক্ষর নাইকো পেটে, চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে।' এখনকার পেটে কত অক্ষর তা নিয়ে যাঁদের ভাবনা তাঁরা ভাবুন। আমরা শুধু জানি দেশে সবাই সাক্ষর না হলেও, কলম এখন সর্বজনীন। সত্যি বলতে কী, কলম এখন এতই শস্তা এবং এতই সর্বভোগ্য হয়ে গেছে যে, পকেটমাররাও এখন আর কলম নিয়ে হাতসাফাইয়ের খেলা দেখায় না। কলম তাদের কাছে আজ অস্পৃশ্য।

পণ্ডিতরা বলেন কলমের দুনিয়ায় যা সত্যিকারের বিপ্লব ঘটায় তা ফাউন্টেন পেন। এক কালে বাংলায় তাকে বলা হতো ঝরনা কলম। নামটা রবীন্দ্রনাথের দেওয়াও হতে পারে।

একদিন অফুরন্ত এই কালির ফোয়ারা যিনি খুলে দিয়েছিলেন তার নাম—লুইস অ্যাডসন ওয়াটারম্যান। সেকালের আরও অনেক ব্যবসায়ীর মতো তিনি দোয়াত কলম নিয়ে কাজে বের হতেন। একবার গিয়েছেন আর একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে চুক্তিপত্র সই করতে। দলিল কিছুটা লেখা হয়েছে এমন সময় দোয়াত হঠাৎ উপুড় হয়ে পড়ে গেল কাগজে। আবার তিনি ছুটলেন কালির সন্ধানে। ফিরে এসে শোনেন, ইতিমধ্যে আর একজন তৎপর ব্যবসায়ী সইসাবুদ সাঙ্গ করে চুক্তিপত্র পাকা করে চলে গেছেন। বিমর্ষ ওয়াটারম্যান মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন— আর নয়, এর একটা বিহিত তাঁকে করতেই হবে। জন্ম নিল ফাউন্টেন পেন।

আমার মনে পড়ে প্রথম ফাউন্টেন কেনার কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেশ কয়েক বছর পরের ঘটনা। কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের একটা নামী দোকানে গিয়েছি একটা ফাউন্টেন পেন কিনব বলে। দোকানি জানতে চান, কী

কলম। বাস, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। তিনি আউড়ে চলেছেন,— পার্কার? শেফার্ড? ওয়াটারম্যান? সোয়ান? পাইলট? কোনটার কী দাম সঙ্গে সঙ্গে তা-ও তিনি মুখস্থ বলতে লাগলেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন আমার পকেটের অবস্থা।— তবে হ্যাঁ, শস্তার একটা পাইলট নিয়ে যাও। জাপানি কলম। কিন্তু দারুণ। বলেই মুখ থেকে খাপটা সরিয়ে ধাঁ করে কলমটা ছুড়ে দিলেন টেবিলের এক পাশে দাঁড়-করানো একটা কাঠের বোর্ডের উপর। সার্কাসে খেলোয়াড় যেমন একজন জ্যান্ত মানুষকে বোর্ডের গায়ে দাঁড় করিয়ে ধারালো ছুরি ছুড়ে দেয় তার দিকে, ভঙ্গিটি ঠিক সে-রকম। সার্কাসের খেলায় লোকটি শেষ পর্যন্ত অক্ষত থাকে। আমাকে অবাক করে তিনি কলমটি বোর্ড থেকে খুলে নিয়ে দেখালেন,— এই দেখো। নিব ঠিক আছে। দু'এক ছত্র লিখে দেখিয়ে দিলেন। আমি সেদিন সেই জাদু-পাইলট নিয়েই ঘরে ফিরেছিলাম। পরে নামী দামি আরও নানা নামের নানা জাতের ফাউন্টেন পেন হাতে এসেছে। কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিলাম সেই জাপানি পাইলটকে। ফাউন্টেন পেনের এক বিপদ, তা লেখককে নেশাগ্রস্ত করে। অবশ্য যদি পয়সাওয়ালা লেখক হন। বিখ্যাত লেখক শৈলজানন্দ একবার আমাকে দেখিয়েছিলেন তাঁর ফাউন্টেন সংগ্রহ।— ডজন-দু'য়েক তো হবেই। পার্কারই ছিল বেশ কয়েক রকম। শৈলজানন্দ বলেছিলেন, এই নেশা পেয়েছি আমি শরৎদার কাছ থেকে। হ্যাঁ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁরও ছিল ফাউন্টেন পেনের নেশা।

আদিতে ফাউন্টেন পেনের নাম ছিল 'রিজার্ভার পেন'। ওয়াটারম্যান তাকেই অনেক উন্নত করে তৈরি করেছিলেন ফাউন্টেন পেন। আমাদের ঝরনা কলম। গাঁয়ের ছেলে আমি অবশ্য ফাউন্টেন পেন হাতে তুলে নিয়েছি অনেক পরে। আমি ছিলাম কালি কলমের ভক্ত। অর্থাৎ, দোয়াত আর নিবের কলমের। বাঁশের বা কঞ্চির কলমকে ছুটি দিই শহরে হাইস্কুলে ভর্তির পর। কালি বানানোও বন্ধ তখন। কাচের দোয়াতে আমরা কালি বানাতাম কালি ট্যাবলেট বা বড়ি-গুলি দিয়ে। লাল নীল দু'রকম বড়িই পাওয়া যেত। অবশ্য তৈরি কালিও পাওয়া যেত দোয়াতে এবং বোতলে। তাদের বাহারি সব নাম, কাজল কালি, সুলেখা ইত্যাদি। বিদেশি কালিও পাওয়া যেত। তবে তা প্রধানত ফাউন্টেন পেনের জন্য। নিব এবং হ্যান্ডেলও ছিল রকমারি। সুচালো মুখের নিবের মতো ছিল চওড়া মুখের নিব, যার যেমনটি চাই। হ্যাঁ, বিদেশে উন্নত ধরনের নিবও বের হয়ে ছিল একসময়। সে সব গোরুর শিং নয়তো কচ্ছপের খোল কেটে তৈরি। খুবই টেকসই। পালকের কলম তাড়াতাড়ি ভোঁতা হয়ে যায়, তাই এই ব্যবস্থা। কখনও বা শিংয়ের নিবের মুখে বসানো হতো হিরে। ফাউন্টেন পেনের প্লাটিনাম, সোনা— এসব দিয়ে মুড়ে তাকে আরও দামি, আরও পোক্ত করা হতো। এসব করে রকমারি চেহারার শস্তা দামি ফাউন্টেন পেন বাজারে ছেড়ে ক্রমে হঠিয়ে দেওয়া হলো দোয়াত আর কলমকে। আমরা যখন কলেজে পড়ছি তখন বলতে গেলে সব পড়ুয়ার পকেটেই ফাউন্টেন পেন। কঞ্চির কলম, খাগের কলম, পালকের কলম সব উধাও। সেই সঙ্গে শিক্ষিত ঘরে, কিংবা অফিসে আদালতে টেবিল থেকে উধাও জোড়া দোয়াত কলম— সেগুলো সাজিয়ে রাখার আসবাব। কালির আধার, ব্লটিং-পেপার সব। এক সময় লেখা শুকানো হতো বালি দিয়ে। পরে ব্লটিং পেপারে। সব মিলিয়ে লেখালেখি রীতিমতো ছোটোখাটো একটা অনুষ্ঠান।

দোয়াত যে কত রকমের হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। কাচের, কাট-গ্লাসের, পোর্সেলিনের, শ্বেতপাথরের, জেডের, পিতলের, ব্রোঞ্জের, ভেড়ার শিংয়ের, এমনকী সোনারও। গ্রামে কেউ দু'একটা পাশ দিতে পারলে বুড়ো-বুড়িরা আশীর্বাদ করতেন— বেঁচে থাকো বাছা, তোমার সোনার দোয়াত কলম হোক। সোনার দোয়াত কলম যে সত্যই হতো; তা জেনেছিলাম সুভো ঠাকুরের বিখ্যাত দোয়াত সংগ্রহ দেখতে গিয়ে।

সাহিত্য এবং ইতিহাসের নানা চরিত্র পর্যন্ত যোগ করা ছিল কোনও কোনও দোয়াতে। অবাক হয়ে সেদিন মনে মনে ভাবছিলাম, এই সব দোয়াতের কালি দিয়েই না শেক্সপিয়ার, দান্তে, মিল্টন, কালিদাস, ভবভূতি, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস থেকে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র সব অমর রচনা লিখে গেছেন। হায়, কোথায় গেল সে সব দিন। এখন ফাউন্টেন পেন! ক্রমে তা-ও বুঝিবা যায় যায়। এখন বল-পেন বা ডট পেন। এক রোগা লিকলিকে রিফিলে কে কত দূর দৌড়াতে পারে তা নিয়ে তার গর্ব। ফাউন্টেন পেনও অবশ্য কম যায় না। একটা বিদেশি কাগজে ফাউন্টেনের বিজ্ঞাপনে দেখছিলাম ওঁদের তহবিলে নাকি রয়েছে সাতশো রকম নিব। যাঁরা গান চর্চা করেন তাঁদের জন্য, যাঁরা শ্রুতিলেখক বা স্টেনোগ্রাফার তাঁদের জন্য, যাঁরা বাঁ হাতে লেখেন তাঁদের জন্য, এক কথায় সব ধরনের লেখকের জন্য আলাদা আলাদা নিব। যন্ত্রযুগ সকলের দাবি মেটাতেই তৈরি। হ্যাঁ, টাকার কুমিরদের খুশি করারও ব্যবস্থা তাঁদের হাতে। একটি কলমের দাম ধার্য হয়েছে আড়াই হাজার পাউন্ড (এক পাউন্ড সমান পঁচাত্তর টাকা, হিসাব করে দেখো কত টাকা!) সে কলমের সোনার অঙ্গ, হিরের হৃদয়। সোনায় গড়া হিরে বসানো জড়োয়া কলমের দাম তো হবেই। দামি বল পয়েন্টও আছে বটে।

আশ্চর্য, সবই আজ অবলুপ্তির পথে। কমপিউটার তাদের জাদুঘরে পাঠাবে বলে যেন প্রতিজ্ঞা করেছে। ফলে আমার মতো আরও কেউ কেউ নিশ্চয় বিপন্ন বোধ করছেন। মানুষের হাত থেকে যদি কেড়ে নেওয়া হয় কলম, যদি হাতের লেখা মুছে যায় চিরকালের জন্য তবে কী আর রইল? বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন 'লাঠি তোমার দিন ফুরাইয়াছে'। কলমের দিনও কি ফুরালো? হতে পারে। কিন্তু ইতিহাসে ঠাঁই কিন্তু তার পাকা। যাঁরা ওস্তাদ কলমবাজ তাঁদের বলা হলো 'ক্যালিগ্রাফিস্ট' বা লিপি-কুশলী। মুঘল দরবারে একদিন তাঁদের কত না খাতির, কত না সম্মান! শুধু মুঘল কেন, বিশ্বময় সব দরবারেই। আমাদের এই বাংলা-মুলুকেও রাজা জমিদাররা লিপি-কুশলীদের গুণী বলে সম্মান করতেন, তাঁদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতেন। সাধারণ গৃহস্থও লিপিকরদের ডেকে পুথি নকল করাতেন। এখনও পুথি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ''সমানি সম শীর্ষাণি ঘনানি বিরলানি চ।'' সব অক্ষর সমান, প্রতিটি ছত্র সুশৃঙ্খল পরিচ্ছন্ন। এক এক জনের যাকে বলে— মুক্তোর মতো হস্তাক্ষর। অথচ কত সামান্যই না রোজগার করতেন ওঁরা।

চারখণ্ড রামায়ণ কপি করে একজন লেখক অষ্টাদশ শতকে পেয়েছিলেন নগদ সাত টাকা, কিছু কাপড় আর মিঠাই। এক সাহেব লিখে গেছেন উনিশ শতকে বারো আনায় বত্রিশ হাজার অক্ষর লেখানো যেত। তবু পুথির কত না মাহাত্ম্য। তাকে ঘিরে লিপিকরের কত না গর্ব। অনেক পুথিরই— খবরদার! এ পুথি যেন কেউ চুরি করার চেষ্টা না করে।

কলমকে বলা হয় তলোয়ারের চেয়েও শক্তিধর। ফাউন্টেন পেনও হয়তো আভাসে ইঙ্গিতে তা-ই বলতে চায়। কেননা, অনুষঙ্গ হিসাবে 'ব্যারেল' 'কার্টিজ' এসব শব্দ শোনা যায়। কিন্তু কদাচিৎ বারুদের গন্ধ কানে পৌঁছায়। অন্যদিকে ইতিহাসে কিন্তু অনেক পালকের কলমধারীকে সত্যই কখনও কখনও তলোয়ার হাতে লড়াই করতে হয়েছে ক্রূর কিংবা মিথ্যাচারী প্রতিপক্ষের সঙ্গে। কলকাতার ইতিহাসেও এ ধরনের 'ডুয়েল' বা দ্বৈরথের কাহিনি রয়েছে। সুতরাং, যখন দেখি এত পরিবর্তনের মধ্যেও কেউ কলম আঁকড়ে পড়ে আছেন তখন বেশ ভালো লাগে। ভাবতে ভালো লাগে আমাদের কালের অধিকাংশ লেখকই এখনও কলমে লেখেন। অনেক ধরে ধরে টাইপ-রাইটারে লিখে গেছেন মাত্র একজন। তিনি অন্নদাশঙ্কর রায়। গত ক'বছর ধরে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও টাইপ-রাইটার ধরেছেন। অন্যরা প্রায় সবাই লিখছেন কলমে। অবশ্য ফাউন্টেন পেন কিংবা

বল-পেনে। সম্ভবত শেষ পর্যন্ত নিবের কলমের মান মর্যাদা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন একমাত্র সত্যজিৎ রায়। তাঁর অনেক সুস্থ সুন্দর নেশার একটি ছিল লিপিশিল্প। তাঁর হাতের লেখার কুশলতার সঙ্গে অন্যান্য শিল্পকর্মের সম্পর্ক থাকা খুবই সম্ভব। কে না জানেন, রবীন্দ্রনাথ বেশি বয়সে যে চিত্রশিল্পী হিসাবে বিশ্বময় সম্মানিত হয়েছিলেন, তার সূচনা কিন্তু হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির পাতায়। অক্ষর কাটাকুটি করতে গিয়ে আনমনে রচিত হয়েছিল ছন্দোবদ্ধ সাদা-কালো ছবি। কমপিউটারও নাকি ছবি আঁকতে পারে। কিন্তু সে ছবি কতখানি যন্ত্রের, আর কতখানি শিল্পীর?

আমি কালি-খেকো কলমের ভক্ত বটে, কিন্তু তাই বলে ফাউন্টেন পেন বা বল-পেনের সঙ্গে আমার কোনও বিবাদ নেই। কেননা, ইতিমধ্যেই বল-পেনের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছি আমি। মনে মনে সেই ফরাসি কবির মতো বলেছি— 'তুমি সবল, আমি দুর্বল। তুমি সাহসী, আমি ভীরু। তবু যদি আমাকে হত্যা করতে চাও, আচ্ছা, তবে তা-ই হোক। ধরে নাও আমি মৃত।'

হ্যাঁ, একবার অন্তত নিবের কলমকে দেখা গেছে খুনির ভূমিকায়। অসাধারণ লেখক, তোমার আমার সকলের প্রিয় 'কঙ্কাবতী' 'ডমরুধর'-এর স্বনামধন্য লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মারা গিয়েছিলেন নিজের হাতের কলম হঠাৎ অসাবধানতাবশত বুকে ফুটে গিয়ে। সেই আঘাতেরই পরিণতি নাকি তাঁর মৃত্যু।

(সম্পাদিত)

শ্রীপান্থ (১৯৩২—২০০৪) : লেখাপড়া ময়মনসিংহ আর কলকাতায়। প্রকৃত নাম নিখিল সরকার, শ্রীপান্থ তাঁর ছদ্মনাম। তরুণ বয়স থেকেই সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত। চাকরি করেছেন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে। সাংবাদিকতার পাশাপাশি দীর্ঘদিন গভীর গবেষণা করেছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় সামাজিক ইতিহাস, বিশেষত কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতি। 'দেবদাসী', 'ঠগী', 'হারেম' ইত্যাদি বইয়ের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য কলকাতা বিষয়ক বইগুলিও— 'আজব নগরী', 'শ্রীপান্থের কলকাতা', 'যখন ছাপাখানা এলো', 'মোহন্ত এলোকেশী সম্বাদ', 'কেয়াবাৎ মেয়ে', 'মেটিয়াবুরুজের নবাব', 'বটতলা', 'কলকাতা'। বাংলা মুলুকে প্রথম ধাতব হরফে ছাপা বই হ্যালহেডের 'আ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গোয়েজ'-এর সাম্প্রতিক একটি সংস্করণের দীর্ঘ ভূমিকা তিনি লিখেছেন।

ভারতবাসীর আহার

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আর পাঁচটা বিষয়ে যেমন, অশনভূষণেও ভারতবর্ষ বিচিত্র বিভিন্নতার দেশ— যদিও এই বিভিন্নতার মধ্যেও একটা অন্তর্নিহিত যোগসূত্রের একতা আছে। প্রাকৃতিক আবেষ্টনী জলবায়ু, খাদ্যবস্তুর সমাবেশ, এ সব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার ফলে, পাঞ্জাব, উত্তর-ভারত, বাংলা, মহারাষ্ট্র, দক্ষিণ-ভারত, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলের খাবার আলাদা আলাদা ধরনের। ইউরোপে প্রাকৃতিক পরিবেশ ধরে সমগ্র মহাদেশটাকে দুটো প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে — অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা উত্তর ইউরোপ, আর তার চেয়ে গরম দক্ষিণ ইউরোপ। উত্তর

ইউরোপে লোকে বেশি করে গোরু পোষে। ও অঞ্চলে মাখনটাই সাধারণত ওরা বেশি করে খায়, মাখন দিয়ে (আর অভাবে শূওরের চর্বি দিয়ে) ভাজা বস্তুই বেশি প্রচলিত, আর তা ছাড়া, পানীয় হিসাবে যব থেকে তৈরি বিয়ার মদ উত্তরের দেশে বেশি খায়। দক্ষিণ ইউরোপ হচ্ছে ছাগলের দেশ, আর ঐ অঞ্চলে জলপাই গাছ খুবই হয়। জলপাইয়ের তেল সাধারণত রান্নায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে; আঙুরও ফলে অজস্র, সেইজন্য আঙুরের রসে তৈরি মদ সকলেই খায়। খাবারের এই রকমফের দেখে, উত্তর ইউরোপের সম্বন্ধে বলা হয় Beer and Butter

Area, আর দক্ষিণ ইউরোপের সম্বন্ধে Wine and Olive Oil Area। ভারতবর্ষকে মোটামুটি এই ধরনে ভাগ করা যেতে পারে— পাঞ্জাব, উত্তর ভারত, মহারাষ্ট্রের শুখনো অঞ্চল, আর সমুদ্রের উপকূলের বর্ষার দেশ; আর সাধারণ খাওয়া ধরে উত্তর অঞ্চলের নাম করা যায় Wheat and Dal and Ghee Area অর্থাৎ রুটি দাল আর ঘিয়ের দেশ, আর বাংলা, উড়িষা, আসাম, মাদ্রাজ, বোম্বাইয়ের কেরলের সমুদ্রতীরের অঞ্চলগুলিকে বলা যায় — Rice & Fish and Oil Area। অর্থাৎ ভাত, মাছ, তেলের দেশ। অর্থাৎ ভাত, মাছ, তেলের দেশ। এই তেল সব জায়গায় একই নয়, বাংলা, আসাম, উড়িষ্যায় সরষের তেল, অন্ধ্র, কর্ণাট, তামিলনাড়ুতে তিলের তেল, কেরলে নারকলের তেল— ঘী খাইয়েরা এর একটাও পছন্দ করে না (আজকার 'ভেজিটেবল ঘী'র কল্যাণে এ বিষয়ে ভারত সমভূম হয়ে যাচ্ছে। ভারতের আহারে এর আগমনে এক ধরনের বিপ্লব এসে গিয়েছে)।

খাওয়া-দাওয়ায় পার্থক্য অল্প-বেশি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে থাকলেও, কতকগুলি ব্যাপারে এই খাওয়া-দাওয়াতেও একটা নিখিল ভারতীয় সাম্য দেখা যায়। ভারতীয় খাদ্যের প্রথম কথা— এতে নিরামিষের আধিপত্য। ভারতের সাধারণ খাওয়া, জাতীয় আহার হচ্ছে দাল-ভাল বা দাল-রুটি (এই রুটি কোথাও গমের আটা থেকে হয়, কোথাও বা যব থেকে, কোথাও আবার বাজরা বা মাড়ুয়া থেকে)। দালে একটু মশলা আর তেল বা ঘী থাকা চাই। ভারতের National Dish — জনপ্রিয় খাদ্য হচ্ছে ভাত আর তরকারি, তা সে নিরামিষ দাল বা সবজির ঝোল, ডালনা, শুকতোই হোক, বা মাছ মাংসের তরকারিই হোক। আন্তর্জাতিক খাদ্য-তালিকায় ভারতবর্ষ থেকে দুটি জিনিস গৃহীত হয়েছে, প্রায় সব দেশের রেস্তোঁরায় এই খাবার কখনও- না কখনও পরিবেশিত হয়ে থাকে, আর লোকে আগ্রহ করে খায়ও। সে দুটি হচ্ছে Rice and Curry অর্থাৎ মশলা-দেওয়া তরকারি (মাংস, ডিম বা মাছের) আর ভাত, আর Chutney অর্থাৎ মশলাদার টক-মিষ্টি চাটনি। এছাড়া, দক্ষিণ ভারতের ঝাল-টক দালের সুপ—যাকে 'রসম' বলে, সেটাও একটি ইংরেজ-পছন্দ খাদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তামিলে এর নাম "মুলগুতন্নীর" অর্থাৎ লঙ্কার জল, Pepper water, এই নাম ইংরেজের মুখে হয়ে দাঁড়িয়েছে Mulliga-tawney soup।

আরও কতকগুলি খাবারের জিনিস আছে, যেগুলি অতি প্রাচীনকাল থেকেই সমগ্র ভারতে জনপ্রিয় খাদ্য, তবে ভারতের বাইরে কারি-ভাত আর চাটনির মতো এতটা প্রসার লাভ করেনি। যেমন, খিচুড়ি — এটি সর্বত্রই প্রচলিত, কিন্তু ভারতের বাইরে দাল তেমন চলে না বলে খিচুড়ি বাইরের লোকেদের পছন্দসই হওয়া কঠিন। আর একটি ভারতীয় খাদ্য হচ্ছে পায়স বা পরমান্ন— প্রচুর খাঁটি দুধ দিয়ে তৈরি হলে এটি একটি দেবভোগ্য খাদ্য হয়, কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য আর অন্তিক-প্রাচ্য দেশ ছাড়া যেমন আরব দেশ, গ্রিস — অন্যত্র এই পায়েসের তেমন রেওয়াজ নেই। ভারতের লুচি বা পুরিও তেমন বাইরে নিজের স্থান করে নিতে পারেনি।

ভারতবর্ষের পাকপদ্ধতির কৃতিত্ব বেশির ভাগ হচ্ছে নিরামিষ খাদ্য নিয়ে, আর নিরামিষের মধ্যে ভারতবর্ষ কতকগুলি ভালো মিষ্টান্নের সৃষ্টি করেছে, কিন্তু সেগুলিও জগৎ জোড়া হতে পারেনি। ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলের মাছের রান্নার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আর তার আছে, যেমন বাংলাদেশে। মাংস রান্নায় ভারতবর্ষ ইরানের অনুকরণই বেশি করেছে। ইরানের রান্নায় মশলার একটু আধিক্য হয়ে সৃষ্টি হয়েছে ভারতের মোগলাই রান্না— রন্ধনজগতে এর একটা নিজস্ব স্বতন্ত্র স্থান আছে।

ভারতবর্ষ মুখ্যত নিরামিষ-ভোজীর দেশ। মাছ মাংস যারা খায়, তাদের সংখ্যা অবশ্য কম নয়। কিন্তু অন্য দেশের তুলনায় মাংস খাওয়াটা এদেশে খুবই কম। যারা খায়, তারা আবার প্রত্যেক দিন খায় না, বা পায় না। এ দেশে নিরামিষ খাদ্য-শস্য, শাক-সবজি, দাল, দুধ, এই সবেরই চল বেশি। নিরামিষ খাদ্যের সুলভতা, আর গরম দেশ বলে নিরামিষ খাদ্যের স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগিতা, এই দুই কারণ ছাড়া দেশের জনসাধারণের মধ্যে অহিংসার আদর্শের ব্যাপক আর গভীর প্রসার — এ দেশের নিরামিষ আহারের দিকে আকর্ষণের একটা বড়ো কারণ। আমিষ-প্রিয় বহু জাতি ভারতে এসে ক্রমে নিরামিষের ভক্ত হয়ে পড়েছে। ভারতের আর্যদের কথাও এই — আগে আর্যরা ছিল আমিষ প্রিয়, পরে প্রধানত নিরামিষাশী বা শাকাহারী।

প্রাগৈতিহাসিক কালে মানুষ পশু পক্ষীর মতো খাদ্য সংগ্রহ করে বেড়াত—শিকার করে মাছ ধরে বা কুড়িয়ে বাড়িয়ে বা মাটি খুঁড়ে বা খুঁটে পশু বা পক্ষীর মাংস, মাছ, কচ্ছপ, কাঁকড়া, শামুক, গুগলি কন্দ-মূল, পোকা-মাকড় যা পেত সবই খেত। পরে মানুষ পশু পালন শিখলে, যব, ধান, গম, বাজরা প্রভৃতির চাষ শিখলে, তখন গৃহপালিত পশুর দুধ আর মাংস, আর চাষের ফল শস্য, বিশেষ করে তার ভোগে এল, মানুষ খাবার সংগ্রহ করার আদিম অবস্থা থেকে খাদ্য প্রস্তুত আর সঞ্চয় করার উন্নত অবস্থায় এসে দাঁড়াল। এই সময়েই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের মধ্যে খাদ্য বিষয়ে অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেল—পশুপালক অর্ধ-যাযাবর জাতির মানুষ যেমন আদিম আর্যরা ছিল, দুধ আর মাংসের দাস হয়ে পড়ল, আর নানা চাষি জাতির মানুষ, যেমন নিষাদ বা অস্ট্রিক প্রমুখ ভারতের অনার্য, তাদের মধ্যে চাল দাল শাক-সবজি (আর যেখানে পাওয়া যেত সেখানে মাছ, আর গৃহপালিত হাঁস মুরগি পায়রা প্রভৃতি পাখির মাংস), এই সবেরই প্রচলন বেশি হলো। গোরু ছাগল ভেড়া ঘোড়া — ভারতের অনার্যদের মধ্যে এই সকল পশুর রেওয়াজ ততটা ছিল না — চাষের কাজেও মানুষ বলদ-ঘোড়া লাঙ্গলের ব্যবহার তখন করত না, 'জুম' চাষ বা কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে হাতের সাহায্যে চাষ, এই-ই করত। তবে এরা শূওর পুষত, শূওরের মাংস খেত।

এই রকম নানা পরিবেশের ফলে, সাধারণত আর্যেরা ভারতে আসবার আগেই ভাত, দাল, শাকসবজি, কিছুটা মাছ আর মাংস, এই ছিল প্রাগার্য জাতির মানুষের খাওয়া। আর্যেরা এল পশুপালন দুগ্ধপ্রিয় মাংসাশী জাতির মানুষরূপে। তাদের প্রিয় খাদ্য আগুনের মধ্যে দিয়ে হোম অনুষ্ঠান করে, তাদের উপাস্য দেবতাদের নিবেদন করত। এই খাদ্য ছিল, দম-বন্ধ করে অথবা অন্য নিষ্ঠুরভাবে 'আলম্ভন' করা বা হত্যা করা ছাগল, ভেড়া, গোরু, ঘোড়ার মাংস ও চর্বি, যবের রুটি 'পুরোডাশ', দুধ, ঘী, আর মাদক সোম-রস। এই সব জিনিস না হলে, আগুনে ফেলে দেবতাদের জন্য এগুলি নিবেদন না করলে, তাদের উপাসনা হতো না। অনার্যদের পূজার রীতি অন্যধরনের ছিল। আগুনের পাট এতে ছিল না। দেবতার মূর্তি বা প্রতীকের সামনে, নানা প্রকারের কাঁচা শস্য, ফলমূল, আর রান্না করা সুখাদ্য অর্পিত হতো, দেবতার প্রসাদ বলে লোকে তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে খেত। এই সুখাদ্যে কিছু পরিমাণ মাছ মাংস ডিমও দেওয়া হতো (ডিম এখন ভারতের হিন্দু সমাজে যেখানে আর্য বা ব্রাহ্মণ মনোভাব প্রবল সেখানে আর চলে না, কিন্তু নেপালে, ভারতের পূর্ব সীমান্তে আর ভারতের বাইরে ডিমের ব্যবহার দেখা যায়)। পশু বলি হতো, এক কোপে পশুর মাথা কেটে ফেলে, শরায় করে রক্ত নিয়ে দেবতার সামনে রাখা হতো, কোথাও বা সেই রক্ত দেবমূর্তিতে মাখিয়ে দেওয়া হতো। তবে ঠাকুরের ভোগে নিরামিষই, প্রশস্ত ছিল। হোমের অনুষ্ঠানকারী মাংসপ্রিয় আর্য জাতির মানুষ ভারতবর্ষে বসে গেল। অনার্যের প্রভাবের আওতায় এল। দুই জাতির মধ্যে রক্তে ভাষায় সংস্কৃতিতে মিশ্রণ আরম্ভ হলো, অনুলোম আর প্রতিলোম বিবাহের ফলে। মিশ্র হিন্দু জাতির সৃষ্টি হলো। তখন সামিষ আর নিরামিষ আহারের বিভিন্ন আদর্শ ও লোকের চোখের সামনে এসে পড়ল। এই দুইয়েরই সপক্ষে আর বিপক্ষে যুক্তি আর প্রচার চলল। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে এই সামিষ-বনাম-নিরামিষ প্রসঙ্গের অবতারণা দেখা যায়। মাংসই হচ্ছে সব চেয়ে উপাদেয়, পুষ্টিকর আর জনপ্রিয় খাদ্য, এই মত মহাভারতে স্বীকার করা হয়েছে— এটা মাংসপ্রিয় জাতির তরফের কথা; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও শেষ কথা হিসাবে বলা হয়েছে যে, অহিংসার আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে মাংস বর্জন করাই সঙ্গত। অর্থাৎ নিরামিষ ভোজন যে সামিষ ভোজনের চেয়ে দার্শনিক বিচার মতে উচ্চ পর্যায়ের, এই ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে।

ইতিহাসেও তাই দেখা যায়। বৈদিক আর্যের মাংস-ভোজন এক দিকে, আর অন্য দিকে হচ্ছে পরবর্তী কালের আর্যম্মন্য হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে মাংসে বিরতি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে, এক প্রস্থ শালি বা চাউলের ভাত, তার সিকি পরিমাণ ঘী বা তেল মশলা দিয়ে রাঁধা সূপ—সম্ভবত দাল—এই হচ্ছে 'আর্যভক্ত', অর্থাৎ আর্য বা উচ্চ শ্রেণির হিন্দুর খাওয়া। অবর বা নিম্নশ্রেণির খাদ্যে দাল আর ঘী বা তেলের অংশটা কিছু কম।

এই দাল-ভাত (কোথাও কোথাও পরবর্তীকালে দাল-রুটি) ভারতের সবচেয়ে লক্ষণীয় খাদ্য হয়ে দাঁড়ায়। তুর্কি মুসলমানেরা ভারত জয় করে উত্তর ভারতের রাজা হয়ে বসল খ্রিস্টীয় এগারোর শতকে। তারা রাজকার্যে সাহিত্যে ফারসি ভাষা ব্যবহার করত। তারা কি তুর্কি, কি পাঠান বা আফগান, কি ইরানি বা পারসিক—স্বদেশে খেত গমের আটার রুটি আর ভেড়ার মাংসের তরকারি— কাবাব বা শূলপক্ক মাংস, বা কোর্মা অর্থাৎ ব্যঞ্জন। এদেশে এসে তারা দেখলে, হিন্দুরা মাংস দিয়ে রুটি খায় না, তারা খায় দাল দিয়ে ভাত, শস্য দিয়ে শস্য; তাই অবাক হয়ে ফারসি ভাষায় মন্তব্য করে গেল, 'হিন্দুআন রল্লা-বা বা ঘল্লা মি-খৌর্দন্দ, ওঅ মি-গোয়ন্দ 'দাল-ভাত' যা 'দাল-রোতি' (— 'হিন্দুরা দানা দিয়ে দানা খায় আর বলে দাল-ভাত বা দালরোটি)। এই দাল-ভাত খাওয়ার ধারা আজ পর্যন্ত সারা ভারতব্যাপী প্রধান খাদ্য-ধারারূপে অব্যাহত আছে। জাহাঙ্গির বাদশাহের সময়ে, খ্রিস্টীয় সতেরোর শতকের প্রারম্ভে, ওলন্দাজ পর্যবেক্ষক Pelsaert পেলসের্ত বলে গিয়েছেন, ভারতের লোকেদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে সিদ্ধ চাল বা ভাত, তার সঙ্গে দাল, আর তার উপর এক খামচা ঘী।

ভারতে হিন্দু আমলে যে মাংস রাঁধার পদ্ধতি ছিল, তার বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায় না। মাংসে মশলা ব্যবহারের কথা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে। 'নল-পাক' অর্থাৎ নলরাজার নামে প্রচলিত রন্ধন বিষয়ে যে সংস্কৃত বই প্রচলিত, তাতে অনেক রকমের ভাতের কথা আছে, শাক তরকারি মাংসের কথা কম। পুরাতন বাঙলা সাহিত্যের বইয়ে রন্ধনের বর্ণনা আর নানা প্রকারের ব্যঞ্জনের নাম থেকে আমরা খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে, চৈতন্যদেবের সময় থেকে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, বাঙালির আমিষ আর নিরামিষ খাদ্যের একটা পরিচয় পাই। তেমনি হিন্দি আর উত্তর ভারতে লেখা সংস্কৃত বই থেকে উত্তর ভারতের 'কচ্চী' অর্থাৎ কাঁচা ভোজ — দাল, ভাত, শাক, তরকারি— আর 'পক্কী' অর্থাৎ ঘৃতপক্ক উচ্চ শ্রেণির ভোজ—পুরি, কচৌরি, লাড্ডু, মিঠাই, পেঁড়া প্রভৃতির বর্ণনা পাই। খাবারের নাম থেকে তার প্রাচীনতা ধরা যায়। লাড়ু, পেঁড়া,খাজা, পূয়া বা মালপোয়া, বুঁদিয়া এই মিষ্টান্নগুলি মুসলমান-পূর্ব যুগের। মোহনভোগ নামটা প্রাচীন—এটির কথা সংস্কৃত বইয়ে পাওয়া যায়, ভারতের কোথাও কোথাও এই নাম প্রচলিত আছে, কিন্তু আরবি হালুয়া এই শব্দকে অপ্রলিত করে দিয়েছে। গজা, বালুকাশাহি, জিলেবি, বরফি, কালাকন্দ—এগুলি পারস্য দেশ থেকে এসেছে। 'গজা' নামটির মূলরূপ শুনলে অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু এই জনপ্রিয় মিষ্টান্নটি আর খেতে চাইবেন না।—ফারসি ''গও-জবান'' অর্থাৎ গোজিহ্বা। তা থেকে ''গও-জআঁ, গওজাঁ, গজা'' — নামের এখন এমন পরিবর্তন হয়েছে যে মূল গজার রূপ বর্ণনের জন্য আমরা এর ব্যাখ্যা করে বলি—'জিভেগজা'।

ভারতবর্ষের মিষ্টান্ন খুবই বিখ্যাত কিন্তু মিষ্টান্ন বিষয়ে মুসলমান জগৎ আর ইরানি জগৎ, আর ভারতবর্ষ, প্রায় একই পর্যায়ে পড়ে। আমাদের ভারতীয় মিষ্টান্ন দুই প্রকারের—এক দুধ জমিয়ে আর দুধ ফাটিয়ে, ক্ষীর আর ছানার আধারে তৈরি মিষ্টান্ন; যেমন পেঁড়া, বরফি, কালাকন্দ, গোলাপজাম, রাবড়ি;আর সন্দেশ, রসগোল্লা, ছানাবড়া, ছানার মুড়কি, চমচম। দুধ ফুটিয়ে ছানা করে তার মিষ্টান্ন বাংলা দেশের বৈশিষ্ট্য—ভারতের অন্যত্র ছানার রেওয়াজ নেই। বাংলার রসগোল্লা এখন নিজগুণে 'বঙ্গাল-মিঠাই' নামে সমগ্র ভারতের এক অতি বিখ্যাত মিষ্টান্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে—বহুস্থানে উচ্চাঙ্গের ভোজে রসগোল্লা থাকতেই হবে। দ্বিতীয় প্রকার মিষ্টান্ন হচ্ছে শস্য-চূর্ণের আধারে যবের ছাতু, গমের আটা, চালের গুঁড়া, দালের গুঁড়া প্রভৃতি ঘিয়ে বা তেলে ভেজে নুন বা চিনি বা চিনির রস মিশিয়ে তৈরি নোনতা বা মিষ্টি পক্কান্ন। এর উপরে আবার নারকোল কুচি বা কোরা, পেস্তা বাদাম কিশমিশ প্রভৃতি দেওয়ার রেওয়াজ আছে। ইউরোপের মিষ্টান্নে Cakes and Pastry-তে ডিম থাকা চাইই — ভারতীয় মিষ্টান্নে ডিম থাকে না, ধর্মের দিক দিয়ে ডিম বারণ। হালুয়া দক্ষিণ ভারতের উপমা, লুচি, সিঙ্গাড়া (বা সম্বোসা ধোসা, নানা রকমের বড়া আর বড়ি) ভাজা আর ফুলুরি প্রভৃতি এই পর্যায়ে আসে।

খাঁটি ভারতীয় রান্নায় আবার প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য আছে। উত্তর ভারতের দাল, ভাজা, শাক প্রভৃতিতে যেভাবে 'বঘার' বা ফোড়ন দেওয়া হয়, তা আমাদের দেশের ফোড়ন থেকে বা সাঁতলানো থেকে আলাদা। আবার ভাতে সিদ্ধ করে তরকারির তার বদলানো হয়। দই, তেঁতুল, আমচুর, লঙ্কা, মরিচা, গরমমশলা,

কোথাও বা ভাজা মশলা, নারকোল এসব ভারতীয় রান্নার অন্যতম প্রধান উপকরণ চীনা বা ইউরোপীয় অথবা আরব-ইরান রান্নায় এসবের পাট তেমন নেই।

ভারতের গ্রামীয় বা প্রাদেশিক রান্নার কথা নিয়ে বড়ো একখানি বই লেখা যায়। সুখের বিষয়, বাংলার নিজস্ব রান্নার সম্বন্ধে (খাঁটি বাঙালি রান্না, আর যেসব জিনিস বাঙালির হেঁসেলে স্থান পেয়েছে সেইসব বিদেশি রান্না, এই দুইয়ের সম্বন্ধে) স্বর্গীয় বিপ্রদাস মুখুজ্জে মহাশয়ের বিখ্যাত বই 'পাক প্রণালী' গৌরবের সঙ্গে উল্লেখ করবার।

মুসলমানি অর্থাৎ ইরানি-ভারতীয় (বা মোগলাই) রান্না, ভারতের রান্নারই মধ্যে পড়ে। পোর্তুগিস, ফরাসি, ডচ — এদের কাছ থেকে আর ইংরেজদের কাছ থেকেও অনেক কিছু আমরা নিয়েছি— বিশেষ মাংস-পাকে। ডচেদের Poespas হয়েছে আমাদের 'পিসপাস'— ভাতে মাংসে পাক করা—ঘৃতমিশ্র মশলা কেসর দেওয়া পোলাও নয়। ইংরিজি 'চপ কাটলেট' নামগুলি নিয়েছি, কিন্তু পদ্ধতিটা আমরা পোর্তুগিসদের কাছ থেকে শিখেছি।—ইংরিজি চপ কাটলেটে মাংসকে কিমা করে রাঁধা হয় না, হাড়শুদ্ধ পাঁজরার মাংসই এতে ব্যবহার করা হয়। ইন্দো-পোর্তুগিস যা গোয়ায় আর চাট গাঁয়ে প্রচলিত, আর অ্যাংগ্লো-ইন্ডিয়ান রান্না, যা সারা ভারত জুড়ে ইংরেজ আর ফিরিঙ্গির ইউরোপীয় হোটেল রেস্তোরাঁর বাবুর্চিখানায় প্রচলিত, এদুটিকেও ভারতীয় রান্নার মধ্যে গণ্য করতে হয়।

ভারতবর্ষে কোথাও কোথাও সাত-আট শো, হয়তো হাজার দেড় হাজার বছর ধরে প্রাচীন রন্ধন পদ্ধতি অপরিবর্তিত অবস্থায় পাওয়া যায়। যেমন পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে যে ভোগ দেওয়া হয়— খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ নিরামিষ রান্নার এই নিদর্শন এই কয়েক শত বৎসর ধরে অপরিবর্তিত রূপে চলে এসেছে। তেমনি দক্ষিণ ভারতের অনেক মন্দিরের ভোগের সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। এইগুলির বিশেষ আলোচনার মধ্যে ভারতবর্ষের রন্ধন-শিল্পের ইতিহাসের কথা নিহিত আছে। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরিতে আকবর বাদশার রন্ধনশালার ত্রিশ রকম খাদ্যের উপাদান দেওয়া আছে—দশ রকম শুদ্ধ নিরামিষ, দশ রকম মিশ্র আমিষ নিরামিষ, আর দশ রকম শুদ্ধ আমিষ। দশসের ঘি, দশসের মিসরি, দশসের সুজি, আর অন্য উপকরণ সম্ভবত এইভাবে এই ইচ্ছে বাদশাহি হালুয়ার উপাদানের প্রমাণ।

মোট কথা ভারতবর্ষের লোক যা খায়, তার একটা আলোচনা নানাদিক দিয়ে কৌতুকপ্রদ, শিক্ষাপ্রদ। পার্থক্য নানা রকমের আছে। কিন্তু তবুও একটা সাধারণ ভারতীয়তা আছে। বিদেশ—লন্ডনে, প্যারিসে, নিউ-ইয়র্কে যেসব ভারতীয় ভোজনশালা আছে, সেইগুলির মাধ্যমে ভোজন বিষয়ে যে সাধারণ ভারতীয়তার বৈশিষ্ট্য ধরে দেওয়া হচ্ছে তা স্বীকার করতেই হয়। ভারতীয় ভোজনশালায় এই জিনিসগুলি থাকবেই— ভাত, দাল, নিরামিষ বা মাংস বা মাছের রকমারি তরকারি, পোলাও, হালুয়া ভাজি, পকোড়া, চাটনি, দই, 'রসগুল্লা', 'গোলাব জামুন', পাঁপড়। এই পাঁপড় একটি নিখিল ভারতীয় বস্তু। শব্দটি সংস্কৃত 'পর্পট' রূপে পাওয়া যায়—এটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে কেউ কেউ মনে করেন। 'পর্পট' থেকে 'পপ্পড-পপ্পড়', তাহাতে পাঁপড়, পপ্পড়, পাঁপর, পপডম্ ইত্যাদি আধুনিক রূপ। কিন্তু মনে হয় এই দালের পিষ্ট থেকে তৈরি এই জনপ্রিয় ভারতীয় খাদ্যবস্তু মূলে দ্রাবিড় জাতির দান তুলনীয়, তামিলে দাল অর্থে 'পপ্পু' শব্দ।

ভারতীয় আহারের অনেকখানি অংশই প্রাগার্য যুগের খাদ্যবস্তু আর রন্ধন রীতির আধারে গঠিত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০—১৯৭৭) : ভাষাতাত্ত্বিক, বহুভাষাবিদ এবং জাতীয় অধ্যাপক। জন্ম হাওড়ার শিবপুরে। তিনি 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থ রচনার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে — 'দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ', 'ইউরোপ ভ্রমণ', 'সাংস্কৃতিকী' প্রভৃতি। তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনকথা' একটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য গ্রন্থ। 'পথ-চলতি' তাঁর বিশ্বপরিভ্রমণের ইতিকথা।

পরশমণি

চণ্ডীদাস

এখন তখন নাই নাম ধরি গান গাই
বাঁশি কেনে ডাকে থাকি থাকি।
সেই হৈতে মোর মন নাহি হয় সম্বরণ
নিরন্তর ঝুরে দুটি আঁখি॥
একলা মন্দিরে থাকি কভু তারে নাহি দেখি
সেহ কভু না দেখে আমারে।
আমি কুলবতী রামা সে কেমনে জানে আমা
কোন ধনি কহি দিল তারে॥
না দেখিয়া ছিনু ভালো দেখিয়া অকাজ হলো
না দেখিলে প্রাণ কেন কাঁদে।
চণ্ডীদাস কহে ধনি কানু সে পরশমণি
ঠেকে গেলা মোহনিয়া ফাঁদে॥

চণ্ডীদাস : বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি চণ্ডীদাসের জন্ম বীরভূমের নান্নুর গ্রামে। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত সময়ে চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তাঁর রচিত পদ আস্বাদনে শ্রীচৈতন্যদেব আপ্লুত হতেন। চণ্ডীদাস আজও বাংলা ও বাঙালির প্রিয়তম কবি। সহজ ভাষা ও সহজ ভাব—এই ছিল তাঁর কবিপ্রকৃতি।

'পরশমণি' শীর্ষক পদটি 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' গ্রন্থের ৪২ সংখ্যক পদ।

সাজ ভেসে গেছে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

'আজ্ঞে সার, নাম মইলোবাস, নিবাস সাকিন মাদারহাটি, পোস্টাআপিস গোকরোণ, থানা কান্দি, জেলা মুচ্ছিদাবাদ....'

—'ভালো। কী চাই'

—'আজ্ঞে, সাহায্যো!'

—'সাহায্য? কেন? কীসের?'

— 'আজ্ঞে সার, বেউলোর দলের।'

ব্লকের সরকারী সমাজ শিক্ষা সংগঠক ভুরু কুঁচকে তাকান।— 'সে আবার কী?' সঙ্গে এসেছে মতি চৌকিদার। সবিনয়ে হেসে বুঝিয়ে দেয়, 'বেউলানখিন্দর পালা সার। পেচণ্ড বান-বন্যেয় সাজের বাকসোপেঁটরা সব ভেসে গিয়েছে। দেখুন না, দরখাস্তে অঞ্চলপ্রধান সব নিকে দিয়েছেন। মইলোবাস, দরখাস্তটা আগে দাও সারকে।'

অফিসার বাবুটি কলকাতার মানুষ। সবে চাকরি পেয়ে এই অখদ্যে জায়গায় এসেছেন। খিকখিক করে হাসেন।—'তাই বলো। তা কী নাম বললে যেন!'

—মইলোবাস স্যাক, সার।'

অফিসার তাকান লোকটির দিকে। বছর বিয়াল্লিশের মধ্যেই বয়স সম্ভবত। বিশাল শরীর। গায়ে ময়লা হাতাগুটানো রঙিন পানজাবি, পরনে মালকোচা ধরনে ধুতি—এলাকার মাটির হলদে ছোপলাগা, পায়ে রবারের ফাটাফুটো স্যান্ডেল এবং কাঁধে তেমনি শ্রীহীন ঝোলা। লোকটার গায়ের রং তামাটে। খাড়া মস্তো নাক, বড়ো বড়ো কান, টানা চোখে হতচকিত বিহ্বলতা, কপালে তিনটে ভাঁজ। একমাথা বাবরি চুল। তিনি ফের হাসেন— 'তুমি তো শিল্পী তাহলে। আর্টিস্ট! হ্যাঁ?'

মতি হাসে। মইলোবাসও সাহস পেয়ে হাসে। মতির সলাতেই এসেছে। মতি বলে— 'হুকুম পেলে এক আসর গেয়ে দেবে, সার। কিন্তু পেচণ্ড বানে....'

মইলোবাস যুগিয়ে দেয়— 'সাজ ভেসে গিয়েছে।'

অফিসার আরামে হেলান দিয়ে বলেন— 'তো মইলোবাসটা কী, বলো তো?'

পিছনে থেকে তৃতীয় একজন, সে একেবারে তরুণ, কালো বেঁটে ও কুচ্ছিত চেহারা, পরনে ধুতি ও নীলচে হাফশার্ট, ব্যাখ্যা করে দেয়— 'নাম সার মওলা বখ্‌শ। অশিক্ষিত লোক সব। কেউ ডাকে মৌলবাস, কেউ মইলোবাস।'

— 'তুমি কে?'

— 'আমি সার বাহাসতুল্লা। দলে বৈয়ালি করি।'

— 'অ্যাঁ?'

এসব আঞ্চলিক টার্ম ভদ্রলোকের জানবার কথা নয়। মতি সব ব্যাখ্যা করে। বৈয়ালি বা বইয়ালি করা মানে প্রম্পট্ করা। বাহাসতুল্লা অল্পস্বল্প লেখা-পড়া জানে। সে পালার হাতেলেখা মস্তো খাতা প্রম্পট্ করে আসরে। তখন তাকে মাথায় হারিকেন চাপিয়ে আলো দেয় যে তার নাম নগেন বাগদি। আঙুলে সিঙ্গি মাছের কাঁটা ফুটে জ্বর হয়েছে বলে আসতে পারেনি। বানের জল নেমে গিয়ে খালে জলায় এখন বেশ মাছ হচ্ছে।

দরবার করতে আরও সব এসেছে। যে বেউলো সাজে, তার গায়ের রং কালো। হালকা গড়ন। মুখে মেয়েলি ছাঁদ। বছর পনেরো ষোলো বয়স হবে। নাম অমূল্য, জাতে বাউরী। আর লখিন্দর? সে না এসে পারে? দল-দল করেই তার বউ পালিয়েছে। তালাক দিতে হয়েছে। কারণ শ্বশুর লোকটা, ফরাজি সম্প্রদায়ের। তাদের কাছে গানবাজনা হারাম— নিষিদ্ধ। বিয়ের আগে জামাই দলের নিছক 'সাপোর্টার' ছিল। হঠাৎ আগের লখিন্দর খুনের মামলায় জেলে ঢুকল। ঢুকল তো ঢুকলই। ফিরতে বুড়ো হয়ে যাবে। তখন খোঁজো নতুন নখাইকে। লখিন্দর বা নখাই হবে সুপুরুষ — ঢলঢল রূপলাবণ্য, আসরে তাকে দেখাবে দ্বারকানদীর আদিম বিশুদ্ধ আকাশের সেই প্রকৃত চাঁদ (মাদারহাটির ধরণী তহশিলদার আজও বিশ্বাস করেন, সেই চাঁদে আমেরিকান বা রাশিয়ানদের বাবার সাধ্যি নেই পা বাড়ায় এবং সোনাই ফকির হুঁ হুঁ হেসে বলেছিল— 'এ চাঁদ কি সে চাঁদ বটে মানিকরা?') সেই চির অলৌকিক চাঁদ ঢুকবে আসরে, চাঁদসদাগরের চোখের মণি! আর চারু মাস্টারের বেহালা শুনে ছৈরদ্দির বিধবা মেয়েটা তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে। আসরে তখন বিপুল জ্যোৎস্নায় হাজার বছরের গ্রামীণ বিষাদ জেগে উঠবে। সে কী সহজ কথা? খোঁজো সেই আদরের নখাইকে। নখাই মিলেছিল। আকাশ আলি নাম। বাপের নাম আব্বাস হাজি। হজ করেছে—দাঁত পড়েছে। মোড়ায় বসে শণের দড়ি পাকায়। ছেলে নখাই সাজে তো কী করবে? যৈবনে মানুষ বুনো ঘোড়া। বয়স হলে তখন তৌবা করে মক্কা যাবে। ব্যাস!

আকাশ আলি হিরো। তাই তার চুলে তেল বেশি। গায়ে আদ্দির পানজাবি— কিন্তু কুঁচকে জড়োসড়ো। হাতে ঘড়িও আছে। হজে গিয়ে বাপ এনেছিল। পায়ে কাদায় ভূত কাবুলি চপ্পল।

কিন্তু সে বড়ো লাজুক। পিছনেই আছে। দরজার কাছে। আর আছে 'নারাণবাবু' তবলচি। বাবু মনে বাবুবাড়ির গাঁজাখোর উড়ুক্কু মাস্তান ছেলে। বাড়ি পাশের গাঁয়ে। ভদ্রলোকের গাঁ। বাবা ননী মুখুয্যে পোস্টমাস্টার ছিলেন। ছেলে নারাণ ক্লাস ফোরেই বেরিয়ে পড়েছে, স্বাধীনতার স্রোতে ভাসমান। মদতাড়িগাঁজাভাং জমিয়ে টেনেছে এই বয়সেই। কিন্তু সেও শিল্পী ছেলে। তবলায় ঠুংরিগাইয়ে ওস্তাদ হাবল গোঁসাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। গোঁসাই বলেছিলেন— 'আয় শালা, সঙ্গ ধর।' কিন্তু সমফাঁকের মুখে গোঁসাইয়ের থাপ্পড় মারা অভ্যেস। একে তো সব সময় মাথার মধ্যে ভোঁ বাজে। অগত্যা নারাণ জুটেছে বেউলো দলে। ব্লক আপিসে দলের সঙ্গে রিপ্রেজেন্টশনে এসেছে। কারণ সঙ্গে একজন বাবুটাবু থাকা ভালোই, যদি পাত্তা দেন ওনারা।

অফিসার বলেন— 'তাহলে তুমিই চাঁদ সদাগর?'

মইলোবাস সলজ্জ মাথা নাড়ে। মতি বলে— 'শুধু তাই না সার, ও ছিল একসময় এলাকার সেরা পালোয়ান। মালামোতে ওর জুড়ি ছিল না। সাতখানা মেডেল আছে ঘরে। লতুন গামছা যে কত পেয়েছিল, হিসেব নেই। মৌরীগাঁর বাবুরা পেতলের ঘড়া দিয়েছিলেন। ওনাদের গাঁয়ে হায়ার করে এনেছিল পচ্ছিমে পালোয়ান। ভকতরাম নাম। তাকেও ধুলোপিঠ করেছিল আমাদের মইলোবাস। কিন্তু শরীলে ব্যামো ঢুকল। এখন ভেতরটা ঝাঁঝরা...'

অফিসার কেমন করে জানবেন এসব? খরার দুতিনটে মাস বৃষ্টির আশায় গাঁয়ে-গাঁয়ে মালামো হয় দিনক্ষণ দেখে। একজোড়া ঢোল বাজে। ঢোলের বোল ভারি মজার :

চোল্ ঢিপাকাঠি ঢিপ্ ঢিপাং
ওই শালাকে চিৎপটাং...

জড়াজড়ি দুই জোয়ান মাটিতে দাপাদাপি তুলেছে, গগন-পবন দুভাই ঢুলি তাদের ঘিরে দ্রুততালে বাজাতে থাকে... চিৎপটাং....চিৎপটাং চিৎপটাং...এবং একজন চিৎপটাং হলেই ঢোলে তেহাইয়ের শ্বাসছাড়া আওয়াজটি ওঠে—ডুড্ডুম! গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে হাজার গ্রামীণ মানুষ : এই ও-ও-ও। গাঁয়ের বউঝি চমকে উঠেই হাসে। হাসিটি হাজার বছরের।

একদা মইলোবাস ছিল পালোয়ান। পালোয়ান ছাড়া চাঁদ সদাগর মানাবে কেন? সওয়া হাত বুকের ছাতি না হলে কেমন করে বেরোবে ও ভয়ঙ্কর গর্জন : 'সাবধানে চ্যাংমুড়ি কানি!'

মাথায় লাল ঝলমলে পাগড়ি, গায়ে লাল রেশমি বেনিয়ান রাংতার কাজ করা, পরনে মালকোচাকরা লাল কাপড়, আর হাতে হিন্তালের লাঠি। উঁচু হয়ে থাকা মুখ, পাকানো বিশাল গোঁপ, কপালে লাল ফোঁটা—সাজঘর থেকে হুংকার দিতে দিতে আসরে আসে— 'জয় শম্ভো! জয় শম্ভো!'

—'বলো হে চাঁদ সদাগর, একবার পার্ট বলো শুনি!'

মতি শশব্যস্তে বলে — 'নজ্জা করছে সার। সরকারি আপিস বটে কি না। আসরে হলে....'

—'উঁহু, একবার তো শুনি। নৈলে কেমন করে বুঝবো যে সত্যি আছে তোমাদের বেহুলার দল?'

সমস্যা বটে। মতি বলে— 'তিন-পুরুষের দল, সার। নিবাস আলি গোমস্তা পালাটা নেকেছিলেন আমার কত্তাবাবার আমলে। সেই খাতা এখনও আছে। তা থেকে নক্‌লে নিয়ে চলছে। বিশ্বাস না হলে এনকোয়ারি করে আসুন।'

বৈয়াল বাহাসতুল্লা বলে—'আমার দাদো এখনও বেঁচে আছে, সার। তার মুখেই শুনবেন। ছেলেবেলায় তিনি বেউলো সাজতেন! তেমন বেউলো আর হবে না সার। মৌরীতলার বাবুদের কেষ্টযাত্রার দল ছিল। ওনারা দুবছর আটকে রেখে রাধিকে করেছিলেন। শেষে গাঁসুদ্ধ লোক আসর থেকে তুলে নিয়ে আসে। খুব হ্যাঙ্গামা হয়েছিল সার। বাঁশির মতো গলা, আর চেহারাও সার তেমনি। এখন দেখলে মিথ্যে লাগবে।'

বিরক্ত অফিসার বলেন— 'ঠিক আছে। দেখব'খন। কিন্তু হবে কিনা বলতে পারছি না। এখন এসব ব্যাপার আপাতত বন্ধ।'

মইলোবাস অভিমানে মুখ খোলে আবার।—লক্ষ্মীনারাণপুরের মনিরুদ্দি কেষ্টযাত্রার সাজ কিনতে টাকা পেয়েছে। বাবুদের যাত্রার দল তো সব গাঁয়ে টাকা পাচ্ছে। মনিরুদ্দি আমার ভাইরাভাই সার। সে বললে তোমরাও পাবে। তাই এলাম। আসতাম না—বানে যে সাজের বাকসো ভেসে গেল। মাদারহাটিতে এক বুক পানি হয়েছিল, এনকুরি করুন। করে দেখুন!'

অফিসার তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন। তারপর একটু হেসে বলেন— 'চৌকিদার, তুমি কীসের পার্ট করো বললে না তো?'

মতি চৌকিদার—সে সরকারি লোক, পরনে রাজপোশাক, তার দাপটে মাদারহাটি থরথর করে কাঁপে। তারও কালো মুখে লজ্জার রং ঝলকে ওঠে। মাথা নীচু করে বলে— 'আমি সার সঙাল। সঙ দিই। কমিক পার্টও করি। লেজ লাগিয়ে হনুমান সাজি। চাঁদ সদাগরের লৌকো ডুবিয়ে দিই! আবার ফটিকচাঁদ কুম্ভকারও সাজি। কখনও বিবেকও হই। গান গাই।'

—'বাঃ! তাহলে তুমিই একটা গান শোনাও।'

—'আজ্ঞে?'

সকৌতুকে অফিসার বলেন— 'না শোনালে দরখাস্ত পড়ে থাকবে, চৌকিদার।'

অগত্যা একটু কেসে এবং এদিক-ওদিক তাকিয়ে মতি সলজ্জ হেসে বলে— 'বরঞ্চ ফটিকচাঁদের গানটাই গাই, সার।'

—'বেশ, গাও।'

মতি আচমকা লাফ দিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে গেয়ে ওঠে: 'ও কে ডাকলে রে ফটিকচাঁদ পিসে/আষাঢ় মাসে চাক ঘোরে না রইয়েছি বসে/ওকে ডাকলে রে—এ-এ এ/....

আপিসসুদ্ধ তোলপাড় অমনি। এ-ঘর-ও-ঘর কেরানিবাবুরা বেরিয়ে আসেন। বিডিও সায়েব বাইরে। কৃষি অফিসার উঁকি মারেন। প্রৌঢ় হেডক্লার্ক বিরক্ত হয়ে গজগজ করেন। কিন্তু ফাইলের একঘেয়েমি হঠাৎ এক আজগুবি ঘটনার তলায় চাপা পড়ে তো মন্দ না। ভিড় জমেছে বারান্দা অব্দি। আরে বাবা, এতো শহরের কেতাদুরস্ত আপিস নয়। মাঠের মধ্যে একতালা কিছু দালান। পিছনে খাল। দিনমান চাষাভূষো লোকের আনাগোনা। আবহাওয়াটাই এ রকম। মিছিল, দাবিদাওয়া, রিলিফ, সেচ, সার, কতরকম ফরিস্তি। তার সঙ্গে কালচার। হ্যাঁ, ফোক কালচার। জাতীয় সড়কের ধারে এই বাঁজাডাঙায় এক সময় ফণিমনসা কেয়া ঝোপ আর বাজপড়া তালগাছ ছিল। সেখানে এখন এই সব বাড়ি আর ফুলবাগিচা। ইউক্যালিপ্টাসের চিরোল পাতা কাঁপে হাওয়ায়। খালের সাঁকোতে জিপের চাকা ঘটঘটাং আওয়াজ তুলে কংক্রিটে গিয়ে উধাও হয়। মাথার ওপর বিদ্যুতের তার। দূর মাঠের দিগন্তে বিশাল মঞ্চের সারি। ফলকে লেখা আছে 'এগারো হাজার ভোল্ট, সাবধান'। তার নীচে মড়ার মুণ্ডু আর দুটো আড়াআড়ি হাড়। তার আশেপাশে নির্ভীক চাষা লাঙল ঠেলে— উররর্‌র্‌ হট্‌ হেট্‌ হেট্‌...

ততক্ষণে চাঁদ সদাগরও তৈরি। মতির সাহসে সাহস। সামনে এক পা বাড়িয়ে দৈত্যের মতো লোকটা বিকট গর্জে বলে উঠেছে : 'খবর্দার চ্যাংমুড়ি কানি! প্রাণ যদি চলে যায়, পুবের সূর্য যদি ওঠে পচ্চিমে, শিব ছাড়া ভজব না—পস্টো কথা কহে দিলাম। দূর হয়ে যাও! দূর দূর দূর...' এবং তারপর যেন পোজপশ্চার দেখিয়ে বুকের পাশে হাত চেপে চুপ করে গেছে।

হো হো করে হাসেন বাবুরা। কেউ-কেউ বলেন— বরং বেহুলার গান শোনাও হে! বেহুলা কই? আসেনি?

বাউরির ছেলে অমূল্য একটু কেসে এক কানের পেছনে হাত রেখে গেয়ে ওঠে :

একো মাসো দুয়ো রে মাসো
তিনো মাসো যায় রে সোনার কমলা॥
জলে ভেইস্যে যায় রে সোনার কমলা॥
ও কী, জলে ভেইস্যে যায় রে
সোনার কমলা॥'

সত্যি বড়ো মিঠে গলা। সুরে আদিম আবেগ আছে একটা। দুয়েকজন বাবুর ফোক সঙের বাতিক আছে। তাঁরা অভিভূত হন। একজন বলেন—'আমাগো পূর্ববঙ্গে মুসলমানেরাও এগুলা গাইত। আর গাজির গানও ছিল। তহন আমরা সব পোলাপান! এক্কেরে এইটুকুখানি!'

সমাজশিক্ষা সংগঠক বলেন—'রিয়েলি, আমার ধারণাও ছিল না এসব। মুসলমানেরাও বেহুলা-কেষ্টযাত্রা করে? মাই গুডনেস্! শরৎ চাটুয্যের ওই এক গহর ছিল। ভাবতুম, নিছক গুল! অথচ...ভাবা যায় না!'

মাদারহাটির বেহুলা দলটি মুখ তাকাতাকি করে। ছ'মাইল জলকাদার মাঠ ভেঙে এসেছে! সময়টা হেমন্ত। রোদ এখনও কড়া। দরদর করে ঘাম ঝরায়। সবুজ মাঠ এবার পলির রঙে হলুদ। পচা ধানপাতার কটু গন্ধ ছড়াচ্ছে। গাঁয়ে ফিরে এক দফা কটু-কাটব্য শুনতে হবে বুড়োদের। আর কিছু বলার কথা ছিল না? সাজ কেনার সাহায্য চাইতে গেলে এই দুঃসময়ে? ঘরে-ঘরে মুখ চুন, খড়িপড়া চেহারা, রিলিফের পথ চেয়ে উসখুস করছে প্রতীক্ষায়। আর এই দুঃসময়ে কিনা বেউলো দলের সাজ ভেসে গেছে, সাহায্য চাই? লক্ষ্মী-নারাণপুরের মনিরুদ্দি মাস্টার কেষ্টযাত্রার সাজ সাহায্য পেয়েছে, ভালো কথা। সেখানে তো বানবন্যা হয়নি। ডাঙা দেশ। শুখা-খরা নেই। ক্যানেলের জলে চাষ হয়। তাই বলে ডুবো দেশ মাদারহাটির তো এ সখ মানায় না—

তবে সে জন্যে এদের মুখ তাকাতাকি নয়। সার যে গহরের নাম করলেন, তাই শুনে। তার সঙ্গে চাটুয্যেও বললেন। এতেই সব প্রাঞ্জল হয়েছে। নতুন গাঁর গহর আলি পাক্কা ছড়াদার অর্থাৎ কবিয়াল। তার গুরু চাটুয্যে বটেন, তবে শরৎচন্দ্র নন—পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণবাবু এখন বুড়োমানুষ। তার ওপর সেবার গাজনে নিজের বেহাইয়ের নামে (কেলেঙ্কারির) সঙের গান বেঁধে জামাই চটান এবং মেয়ের দুর্ভোগ বাধিয়ে বসেন। শেষে অব্দি মেয়ের মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করেছেন, এই শেষ। ওদিকে গহরের রবরবা বেড়ে যায়। সেই গহরেরও এবার বরাত মন্দ। নতুন গাঁ ডুবেছে। গহর বুক চাপড়ে কেঁদেছে। সদ্য কিনে আনা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণখানাও সর্বনাশা দ্বারকা ভাসিয়ে নিল! রামায়ণ-মহাভারত গেল যাক। ওস্তাদ চাটুয্যে বলেছেন—আমাদের—আমার-গুলো নিয়ে যেও। পদ্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কালিকাপুরাণ, প্রভাসখণ্ড চেয়ে-চিন্তে কদিনে ধারে যোগাড় করেছে রমজান দোকানির কাছে। দোকানির কারবার নুন তেলের। যৌবনে সখ ছিল ছড়াদার হবে। হতে পারেনি। কিন্তু শাস্ত্র-পুরাণতত্ত্বে মহা ধুরন্ধর সে। বড়ো বড়ো কবির আসরে প্রখ্যাত কবিয়ালদেরও আসর থেকে উঠে আচমকা

এমন প্রশ্ন করে, ঘোল খাইয়ে ছাড়ে। এদিকে সন্ধ্যার নমাজের আজান শুনলে মাথায় টুপি দিয়ে মসজিদে যায়। তার তিন ছেলেও ও সব তত্ত্বে বিশারদ। বোলানের দল করেছে। তারা আসরে প্রতিপক্ষকে কাবু করতে চায়। পাল্টা কাবু হলে বাপের কাছে দৌড়ে আসে।.... হ্যাঁ গো, কুশঘাসের জন্ম কীসে বলে দাও তো শিগগির? রমজান হেসে বলে— বরাহ অবতারের তিন গাছা লোম তুলে রেখেছিলেন মহামুনি বাল্মীকি। তাই থেকে কুশ। তবে পাল্লাদারকে শুধোস তো বাবা, আদিতে যখন নিরাকার, তখন ভগবান ভাসলেন বটপত্রে। বটগাছ নিরাকার ব্রহ্মাণ্ডে তাহলে এল কোত্থেকে? এমনি সব পৌরাণিক রহস্যের জগতে বাস তাদের। একখানা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বন্যায় ভেসে গেলে একটা রহস্যময় ভূভাগ হারিয়ে গেল সামনে থেকে। সবে সৃষ্টি বর্ণনাটা পড়া হয়েছিল গহরের। এই দুঃসময়ে দশটা টাকা পাবে কোথায়?

তল্লাটে একখানা আছে বটে, তার খোঁজ গহর রাখে। গুনুটির মুকুন্দ রাজবংশীর। একবার মেডেল আর কলা আসরে ঝুলিয়ে কবির লড়াই চলেছে ঈশানপুরের মেলায়। বিপক্ষ কবিয়াল প্রশ্ন করেছে, ব্রহ্মার কন্যার নাম কী? জবাব জানে না গহর। রসিক শ্রোতা মুকুন্দ আসরেই বসে ছিল। বলেছিল—নামটা আম্মো জানি। পেটে আসছে, মুখে আসছে না। ঘরে শাস্তর আছে আমার। না বলতে পারলে কলা পাবে গহর। কাকুতি মিনতি করে মুকুন্দকে রাজি করাল। দুজনে চুপিচুপি শেষরাতে জলকাদা ভেঙে গুনুটি গেল। লম্ফ জ্বেলে নামটা খুঁজল। হুঁ সন্ধ্যা। দুজনে আসরে ফিরল আবার। গহর সেবার মেডেল পেয়েছিল। সেই থেকে দুজনে বড়ো ভাব। কিন্তু ওই পর্যন্তই। মুকুন্দ প্রাণ গেলেও বই হাতছাড়া করবে না।

এসব খবর কিছু গোপন থাকে না তল্লাটে। গাইয়ে-বাজিয়েদের কাজ মানুষ নিয়ে, মানুষের সঙ্গে। আবেগবান হৃদয়। সহজেই সব গলগল করে উগলে দেয়, সমস্যা বা সুখ দুঃখ। কে না জানে সর্বনাশা বানের পর গহর হাহাকার করে বলে বেড়াচ্ছে, আমার মাগ ছেলে ভেসে গেল না কেন? আমি ভাসলাম না কেন? হায় রে হায়, আমার বুকের নিধি ভেসে গেল...

তাহলে কি সরকার বাহাদুরের দয়া হয়েছে হতভাগা ছড়াদারের প্রতি? মাদারহাটির সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরা মুখ তাকাতাকি করে। খুশি হয়। আশা জাগে। মতি চৌকিদার বলে— 'গহর টাকা পেল, সার?'

শুনেই অফিসার হো হো করে হাসেন। এত জোরে হাসেন! দলসুদ্ধ চোখে পলক পড়ে না। এ হাসি কীসের বোঝে না তারা। একটু পরে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে তিনি বলেন— 'গহরকে চেনো?'

মতি বলে— 'চিনি সার। লতুন গাঁর। উঠ্‌তি কবেল। ভালো গায়।'

অতি গম্ভীর অফিসার মাথা দুলিয়ে বলেন— 'সে গহর নয়। যাক গে, শোনো! এখন তো ফ্লাড্ রিলিফের সময়। এখন কালচারাল ব্যাপারে টাকা-পয়সা দেওয়া আপাতত বন্ধ। কয়েক মাস যাক। এসো। দেখব'খন।'

সকাতরে মইলোবাস বলে— 'সামনে মাসে লবান্ন হবে সার। তখন বায়না পাব। কী নিয়ে গান করব?'

—'নবান্ন?' উনি একটু হাসেন আবার। 'ধান তো পচে গেছে। নবান্ন কীসের?'

গতিক বুঝে মতি ব্যাখ্যা করে— 'ডুবো দেশে বান হয়েছে। কিন্তু ডাঙাদেশে তো ধান হয়েছে সার। সেখানে লবান্ন হবে। মাদারহাটির বেউলো না শুনে লবান্ন হবেই না। খুব নামকরা দল। অঞ্চলে পেধান...'

অফিসারটি ঘড়ি দেখে বিরক্ত হলো এবার।— 'যারা বায়না দেবে, তাদেরই বলো গে না বাবা! আপাতত কোনো উপায় নেই। আচ্ছা, তোমরা এসো। আমি বেরোব...'

সামনে অঘ্রান। এবার অঘ্রানে ডাঙাদেশে অর্থাৎ উঁচু মাটির এলাকায় শুভদিন বেছে বেছে নবান্ন উৎসব হবে গাঁয়ে-গাঁয়ে। হিন্দু-মুসলমান সবারই উৎসব। মুসলমানরা জামাই আনবে। কত খাওয়া-দাওয়া হবে। হবে না শুধু মাদারহাটি—নতুন গাঁ—ন'পাড়া— রামেশ্বরপুর এলাকার বানভাসা গাঁগুলোতে। পচা ধানের কটু গন্ধে বাতাস ভরা এখানে। বাবুরা লঙ্গরখানা খুলেছেন ইতিমধ্যে অনেক জায়গায়। টেস্ট রিলিফের কাজও চলছে অল্পস্বল্প। মাদারহাটির কাদা এখনও শুকোয়নি। ধসে যাওয়া ঘরের উঠোনে অনেক পরিবার খয়রাতি তেরপলের তলায় বাস করছে। কিছু জোতজমিওলা গেরস্থর উঁচু ভিটের বাড়ি এখনও টিকে আছে। বেউলো দলের দু-চারজনেরও দৈবাৎ টিকেছে। ঘর গেছে স্বয়ং চাঁদ সদাগরের। তার ঘরেই ছিল সাজের বাক্স। গাঁয়ের শেষে ঢালু জমিতে তার বাড়ি। নিশুতি রাতে আচমকা বিলের জল হু হু করে এসে ধাক্কা মেরেছিল। কোনোমতে বউ আর চার-পাঁচটা কাচ্চাবাচ্চাকে জানে বাঁচাতে পেরেছিল। তার প্রায় সবই ভেসে গেছে। কিন্তু গতর আছে যখন, সব করে নেবে। আবার ঘর বানাতে পারবে। জমিতে চৈতালি ফলাতে পারবে। তাই সে নিয়ে ভাবনা নেই—ভাবনা সাজ ভেসে গেছে। দেড়-দুশো টাকার কমে এ বাজারে পুরো সাজ হবে না। কিছুটা চাঁদায়, কিছুটা কয়েক আসরের বায়নার টাকা জমিয়ে আগের বছর নতুন সাজ কেনা হয়েছিল। হারমোনিয়াম তবলা ঢোল কত্তালগুলো ভাগ্যিস ছিল আকাশ আলির বাড়ি। উঁচু ভিটে তাদের। সামনের খামার বা উঠোনটাও উঁচু। সেখানে বৃষ্টিহীন রাতে 'রিহাস্যাল' চলে। তাই ও বাড়ি ছিল যন্তরগুলো। যদি সাজের বাক্সটাও রাখা হতো সেখানে, এই বিপদ ঘটত না। তবে এখন আর পস্তে কী হবে?

বিনিসাজে গাইতে গেলে কেউ শুনবেই না পালা। কেন শুনবে? নগদ পাঁচ টাকা বায়না, তিন ধামা মুড়ি, আধ টিন গুড়— তার ওপর বিড়িও আছে। দুরের গাঁ হলে তো ডাল ভাতও খাওয়াতে হয়। এত সব খরচ করে লোকে সাজের ঝলমলানি দেখবে না? তা ছাড়া তলোয়ার? হায় হায়! ও দুটোও বাক্সের মধ্যে ভরা ছিল! মুকুট ছিল। ঝকমকে ত্রিশূল ছিল। বল্লম ছিল। পুঁতির মালা ছিল। হা বাবা আল্লা ভগবান! এর চেয়ে চাঁদ সদাগরকে ভাসিয়ে নিলি না ক্যানে?

মাঠের পথে দলটা গাঁয়ে ফিরে চলেছে। হতাশ, ক্লান্ত, চুপচাপ। মইলোবাস মাথাটা ঝুলিয়ে হাঁটছে সবার পিছনে। তার মনে অপরাধবোধ প্রচণ্ড। তার ঘরেই তো সাজের বাক্স ছিল। এখন ব্যর্থ দরবারের পর সেই অপরাধবোধ আরও তীব্র হচ্ছে। চাঁদ সদাগর সে। তার আত্মায় দাঁড়িয়ে আছে এক অহঙ্কারী উদ্ধত বিশাল পুরুষ—ক্রমশ দিনে দিনে সে তাকে দেখতে পেয়েছে। আসরে জনমণ্ডলীর সামনে যখন সেই ভিতরের পুরুষ পা ফেলে হাঁটে—সাজঘর থেকে আসরে, তার মনে হয় কাকেও পরোয়া করার নেই। গায়ে সাজ চড়ালে দফাদার কনস্টেবল দারোগা এস-ডি-ও ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর তাবৎ সরকারি ব্যক্তি ও ক্ষমতাকে সে গ্রাহ্যই করবে না! আর তখন সে তো এ যুগের মানুষ নয়! তখন তার সাত ছেলে সাত সাতটা বাণিজ্যতরি নিয়ে সমুদ্দুরে চলেছে। তরি ডুবে যাওয়ার খবর দিয়েছে বিবেক। তো কীসের পরোয়া? জয় শম্ভো জয় শম্ভো! চ্যাংমুড়ি কানিকে পুজো করবে তাই বলে? হাতের হিন্তাল যষ্টি নাড়া দিয়ে গর্জন করেছে সে। তার ঠোঁটে ঘৃণা, চোখে ঘৃণা। হুঁ, এখন বাবুই হও, লাট বেলাটিই হও—তফাত যাও। চাঁদ সদাগর জানে শুধু একজনকে। তিনি শম্ভু— শিব। দেবাদিদেব মহাদেব। এই ভাই বইয়াল! আস্তে। পাট মুখস্থ আছে। গায়ে সাজ চড়ালেই সব মুখের ডগায় ভেসে আসে। সাজ চড়ালেই তাকে 'সে' এসে ভর করে—যে মাথা নোয়াতে জানে না। সাজ চড়িয়ে সে স্পষ্ট দেখতে পায়

কঠিনতম লোহার বাসরঘর— দেয়াল ঘুরে হিন্তাল কাঠ কাঁধে নিয়ে পাহারা দেয়। হায়, সেই ঘরে ছিদ্র ছিল। সোনার নখাই নীলবর্ণ হলো। চাঁদ সদাগরের মাথা ঝুলে পড়ে।— 'আঃ আঃ আহা হা!'

—'কী হলো হে মইলোবাস? পাট বুলো নাকি?'

মতি চৌকিদার পিছন ঘুরে বলে। কেউ কেউ হাসে। মইলোবাস বলে, 'না।'

—'কী বুলছ মনে হলো?'

—'হুঁ, একটা কথা ভাই চৌকিদার।'

— 'বুলো।'

এখন নিজেদের ভাষায় কথা বলছে ওরা। এ তো বাবু ভদ্রজনের সঙ্গে কথা বলা নয়, আপিস-কাছারিও নয়। এখন মাতৃভাষায় না বললে সুখ নেই। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে মতি আবার বলে— 'বুলো হে কথাটা!'

—'যদি সাজের বাকসোটা আকাশের ঘরেই থাকত!'

মতি ভর্ৎসনা করে— 'আবার উই কথা? সেই এক কথা?'

—'ই দুঃখুটা মলেও যাবে না ভাই!'

—'আবার কিনব। ভগবান মুখ তুলে তাকাক।'

চুপ করে যায় বিশালদেহী মানুষটা। আবার ভেসে ওঠে কিছু প্রতিচ্ছবি— সামিয়ানার তলায় হ্যাসাগের শনশন শব্দ ভাসে, চারপাশে মুগ্ধ শ্রোতা, চারু মাস্টারের বেহালা বাজে করুণ সুরে। আর সাজঘর থেকে ঝলমল লাল পোশাকে হিন্তালের লাঠি নেড়ে এগিয়ে আসে চাঁদ সদাগর। কী তার রূপ! মুহূর্তে আসর চুপ। কেঁদে ওঠা বাচ্চার মুখে মায়ের থাবা পড়ে। জয় শম্ভো! জয় শম্ভো! যেন আকাশে মেঘ ডাকে।... 'সাজের বাকসোটা!'

—'আবার? তুমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে, মইলোবাস। সাবোধান।'

আবার চুপ। ক্রমশ মাঠ ধাপে ধাপে নেমে গেছে নাবাল অঞ্চলের দিকে। দেখতে দেখতে সূর্যও ডুবেছে। ধূসর আলোয় দূরের গ্রাম কালো হয়ে আসছে। ধানপচার গন্ধ, পলির গন্ধ, মরা জানোয়ারের হাড়গোড়ের গন্ধ। নাক ঢেকে দলটা চুপচাপ থাকে। সবার পিছনে মইলোবাস।

এবং একটু পরেই— 'আঃ আহা হা হা!'

মতি একবার ঘোরে। কিন্তু কিছু বলে না। কী বলবে? হাহাকার তো তার বুকেও কম জমে নেই। ডাঙাদেশে নবান্নের মরশুম এবার তাদের ফাঁকা যাবে। অন্য দল এসে গাইবে। তারা হবে শ্রোতা। গভীর ঈর্ষায় চনমন করবে। ফটিকচাঁদ কুমোর তার মতো করুক না, কে করে! তার মতো হনুমান সাজুক না, কে সাজে!

আবার পিছনে ডুকরে ওঠা চাপা আক্ষেপ—আঃ হা হা হা!

মতি চৌকিদার অফিসারকে বলছিল—এখন শরীলে ব্যামো। ভেতরটা ঝাঁঝরা। ঝাঁঝরাই বটে। সাত বছর ধরে মইলোবাস চাঁদ সদাগরের পার্ট করে আসছে। এ সাত বছর সে মালামো লড়েনি। সাত বছর আগের জ্যৈষ্ঠে তার শেষ লড়াই হয়েছে গঙ্গার পূর্বপারের প্রখ্যাত কুস্তিগির মোহিনীবাবুর সঙ্গে। কী সব মারাত্মক প্যাঁচ জানত

মোহিনীবাবু! এমনভাবে ফেলে দিল যে তারপর বাড়ি ফিরে থুথুর সঙ্গে রক্ত ওঠে। প্রথমটা গ্রাহ্য করেনি। পরে বুকে ব্যথা বাড়লে ডাক্তার দেখিয়েছিল। বুকের ছবি তুলতে হয়েছিল। পাঁজরের একটা কাঠি ভেঙে গেছে। সেই ভাঙা পাঁজর নিয়ে সাত বছর কাটাচ্ছে। কলজেতেও একটু দাগ পড়েছে। এখনও গতর খাটতে মাঝে মাঝে টাটানি টের পায়। বোঝা তুলতে কষ্ট হয়। জোরে চেঁচাতে গিয়েও দম আটকায়।

অথচ যেদিন থেকে চাঁদ সদাগরের সাজ গায়ে চড়াল, যেন ভাঙা ঝাঁঝরা শরীলের মধ্যে এসে দাঁড়াল এক বিশাল শক্তিধর পুরুষ। যতক্ষণ সাজ গায়ে থাকে, ততক্ষণ সে সেই বীর্যবান দুর্ধর্ষ পুরুষ। মেঘের মতো হাঁকলেও দম আটকায় না। আসরে দেবী মনসার সামনে ভাঙা পাঁজরে হাতের থাপ্পর মেরে সগর্জনে বলে— 'সাতটা পুত্রসন্তান আমার, সাতখানি বক্‌খের পাঁজর। ভাঙবি তো ভাঙ রে বুড়ি চ্যাংমুড়ি, তবু কভু ভুরুক্ষেপ নাই!' সামনের মাটিতে জোরে লাথি মারে সে। টেরই পায় না কলেজটা চড়াৎ করে ওঠে কি না। কিন্তু আসরের পর দিনে মাঠের জমিতে হাল বাইবার সময় হঠাৎ খামচানি ব্যথা বুকের মধ্যিখানে—হাত চেপে সে বলদ ডাকায়—ইররর্‌র্‌ হেট্‌ হেট্‌

সেই ব্যথাটা এতক্ষণে অন্ধকার মাঠে জেগে উঠেছে। মইলোবাস ককিয়ে উঠছে পাঁজরে হাত চেপে— 'আঃ হা হা হা !'

মতি ভাবছে সাজের বাকসোর দুঃখে ককাচ্ছে লোকটা, বাহাসতুল্লাও তাই ভাবছে। আকাশ আলি, নারাণবাবু—আর সবাই। জলকাদায় পা ফেলার শব্দ উঠছে। চারদিকে জোনাকি উড়ছে। দূরে শেয়াল ডেকে উঠল। খালে এক কোমর জল। একে-একে পার হয়ে যায় সবাই। ওপারে বাঁধ। জায়গায়-জায়গায় ধসে গেছে। আর মোটে এক মাইল দূরে গাঁ। বাঁধে উঠে মতি চৌকিদার বলে— 'এসো, বিড়ি খেয়ে লিই।'

দেশলাই জ্বালে কেউ কেউ। বিড়ি ধরায়। বৈয়াল বলে— 'চাঁদ সগাদর! বিড়ি লাও হে!'

মতিও ডাকে—'কই হে নখাইয়ের বাপ! ধুঁয়োমুখ করো!'

আকাশভরা নক্ষত্রপুঞ্জ এই হেমন্তের রাতে। বাঁধের ওপর শুকনো মাটিতে বসে পড়েছে সবাই। নক্ষত্র দেখতে বিড়ি টানছে। পাশে জুতো রেখেছে। কাপড় উরুর ওপর গোজা—যা জলকাদা! নীচে ঘন পাটবন। বন্যায় গলা অব্দি ডুবেছিল। অন্ধকার পাটবনের ওপর জোনাকির আলো। আকাশ আলি দেখতে দেখতে ডাকে—'পিতাঠাকুর, উই দ্যাখো তুমার সাজ!' আবার মুখ তুলে আকাশ দেখে আকাশ আলি বা লখিন্দর হাসতে হাসতে ডাকে—'পিতাঠাকুর হে! পরবে নাকি উই সাজ? নকশাখানা দেখো!'

রসিক মতি রসিকতায় সাড়া দিয়ে বলে— 'তুমার পিতাঠাকুরের নাল রং পছন্দ। সেবারে খাগড়ার বাজারে সাহাবাবুর সাজের দোকানে আমার পছন্দ হলো একখানা জামা। ওইরকম কালোর ওপরে সোনালি কাজকরা। বুইলে? খাঁটি বেলবেট। আমি বুললাম—দাম? তো পঞ্চাশ টাকা। তো বুললাম, মইলোবাস, টাকা থাকলে ই সাটজাই লিতাম। তুমাকে যা মানাত! হুঁ! ঘাড় নেড়ে বুললে—আমার নাল রং পছন্দ!'

বৈয়াল বলে— 'পালোয়ান লাল রঙেরই ভক্ত!'

আকাশ ফের ডাকে—'কই বাপ পিতাঠাকুর, নখাই এত ডাকছে, কথা বুলো না ক্যানে?'

তারপর খোঁজ পড়ে যায়। সবাই ডাকাডাকি করে। দলে তো নেই, কখন পিছিয়ে পড়েছে দেখ দিকি! মতি

চেঁচিয়ে ডাকে—'মইলোবাস হে! হেই—ই—ই...'

অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে জলকাদার পৃথিবীতে ডাকটা কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে যায়। ওই পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে কোথায় একা থেকে গেল এক অভিমানী ক্ষুব্ধ সাজহীন বিশাল মানুষ?

ফটিক কুম্ভকার, নখাই আর বৈয়াল খালের জলে নামে। পাড়ে উঠে তিনজনে একগলায় ডাকে—'হেই-ই-ই-ই...'

আলের পথে পা বাড়াতেই ঠোক্কর খেয়ে মতি পড়ে যায়। চেঁচিয়ে ওঠে— 'মইলোবাস! ও মইলোবাস! পড়ে আছ ক্যানে ভাই? কী হলো তুমার? কী হয়েছে?'

নখাই দেশলাই জ্বালে। মুখের ওপর। ঠোঁটের দুপাস রক্ত নিয়ে হাঁফাচ্ছে বিশাল সেই পুরুষ—নাকি বিশাল সেই পুরুষের খড়মাটির টাট—সাজহীন। অনেক কষ্টে বলে—'পা পিছলে পড়েছিলাম।... আমি বাঁচব না হে... বাঁচব না!'

মতি কেঁদে কেটে বলে— 'রেতের বেলা জলকাদার রাস্তায় অমন করে হাঁটে ভাই? বুয়েছি, বুয়েছি! উই কথাটাই তুমাকে খেলে হে! উই ভাবনাটাই তুমার বিনেশ কল্লে! আঃ হা হা!'

তিনজনে ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে চলে চাঁদ সদাগরকে। পাঁজরভাঙা, কলজেয় দাগধরা শরীর থেকে গভীরতর দুঃখের মতো রক্ত গড়ায় কষ বেয়ে। এবার প্রকৃতি নিজের হাতে তাকে শেষবার লাল পোশাক পরিয়ে দিচ্ছেন। তবু সে বিড়বিড় করে বার বার— 'সাজের বাকসোটা ভেসে গেল হে! সাজের বাকসোটা...'

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২) : মুরশিদাবাদ জেলার খোশবাসপুর গ্রামে জন্ম। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্পকার। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নীলঘরের নটী' (১৯৬৬)। বহু উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর লেখা কয়েকেটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস— 'কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি', 'বিপজ্জনক', 'সোনার ঠাকুর', 'তৃণভূমি', 'অলীক মানুষ', 'নির্বাসনের দিন'। 'সাজঘর', 'চেরাপুঞ্জির পথে শীত', 'স্রোত', 'পুষ্পবনে হত্যাকান্ড', 'লড়াই', 'শূন্যের খেলা', 'বুঢ়াপীড়ের দরগতিলায়' প্রভৃতি তাঁর লেখা বিখ্যাত গল্প। 'কর্ণেল' তাঁর সৃষ্ট শিশু-কিশোরসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় চরিত্র। সাহিত্য রচনার স্বীকৃতিতে তিনি 'ভূয়ালকা পুরস্কার', 'বঙ্কিম পুরস্কার', 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার', 'নরসিংহদাস স্মৃতি পুরস্কার', 'শরৎচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার', 'শৈলজানন্দ স্মৃতি পুরস্কার' প্রভৃতি লাভ করেন।

একাকারে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

এসো, এই ঝরনার সামনে—
নতজানু হয়ে
আমাদের দুহাত-এক-করা
অঞ্জলিতে
তোমার পানি আর আমার জল
জীবনের জন্যে
একসঙ্গে একাকারে ভ'রে নিই।

দেখো, জপমালা হাতে
তোমার মা আর আমার আম্মা

জগৎজোড়া সুখ
আর দুনিয়া জুড়ে শান্তির জন্যে
একাসনে
একাকারে প্রার্থনা করছেন।

শোনো
কোরানের সুরাহ্‌র সঙ্গে
উপনিষদের মন্ত্র,
সকালে প্রভাতফেরির সঙ্গে
ভোরের আজান
একাকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯—২০০৩) : বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য নাম। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্ম। স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনের ছাত্র ছিলেন। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'অগ্নিকোণ', 'চিরকুট', 'ফুল ফুটুক', 'যত দূরেই যাই', 'কাল মধুমাস', 'ছেলে গেছে বনে', 'জল সইতে', 'একটু পা চালিয়ে ভাই', 'ধর্মের কল', 'বাঘ ডেকেছিল' প্রভৃতি। তাঁর গদ্য রচনার দৃষ্টান্ত 'কাঁচা-পাকা', 'ঢোল গোবিন্দের আত্মদর্শন', 'ঢোল গোবিন্দের মনে ছিল এই', 'আমার বাংলা', 'নারদের ডায়রি', 'কমরেড কথা কও', 'ফকিরের আলখাল্লা' প্রভৃতি গ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি অনুবাদ করেছেন নাজিম হিকমত, পাবলো নেরুদার কবিতা। বহু পুরস্কারে ভূষিত এই কবি 'সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কার', 'সাহিত্য অকাদেমি' ও 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কারও পেয়েছেন।

বহুরূপী

সুবোধ ঘোষ

হরিদার কাছে আমরাই গল্প করে বললাম, শুনেছেন, হরিদা, কী কাণ্ড হয়েছে?

উনানের মুখে ফুঁ দিয়ে আর অনেক ধোঁয়া উড়িয়ে নিয়ে হরিদা এইবার আমাদের কথার জবাব দিলেন — না, কিছুই শুনিনি।

— জগদীশবাবু যে কী কাণ্ড করেছেন, শোনেননি হরিদা?

হরিদা — না রে ভাই, বড়ো মানুষের কাণ্ডের খবর আমি কেমন করে শুনব? আমাকে বলবেই বা কে?

— সাতদিন হলো এক সন্ন্যাসী এসে জগদীশবাবুর বাড়িতে ছিলেন। খুব উঁচু দরের সন্ন্যাসী। হিমালয়ের গুহাতে থাকেন। সারা বছরে শুধু একটি হরীতকী খান; এ ছাড়া আর কিছুই খান না। সন্ন্যাসীর বয়সও হাজার বছরের বেশি বলে অনেকেই মনে করেন।

হরিদা — সন্ন্যাসী কি এখনও আছেন?

— না, চলে গিয়েছেন।

আক্ষেপ করেন হরিদা — থাকলে একবার গিয়ে পায়ের ধুলো নিতাম।

— তা পেতেন না হরিদা! সে ভয়ানক দুর্লভ জিনিস। শুধু ওই একা জগদীশবাবু ছাড়া আর কাউকে পায়ের ধুলো নিতে দেননি সন্ন্যাসী।

হরিদা — কেন?

— জগদীশবাবু একজোড়া কাঠের খড়মে সোনার বোল লাগিয়ে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে ধরলেন। তখন বাধ্য হয়ে সন্ন্যাসী পা এগিয়ে দিলেন, নতুন খড়ম পরলেন আর সেই ফাঁকে জগদীশবাবু পায়ের ধুলো নিয়েছিলেন।

হরিদা — বাঃ, এ তো বেশ মজার ব্যাপার!

হ্যাঁ, তা ছাড়া সন্ন্যাসীকে বিদায় দেবার সময় জগদীশবাবু একশো টাকার একটা নোট জোর করে সন্ন্যাসীর ঝোলার ভেতরে ফেলে দিলেন। সন্ন্যাসী হাসলেন আর চলে গেলেন।

গল্প শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন হরিদা। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমরা কী বলছি বা না বলছি, সেদিকে হরিদার যেন কান নেই।

হরিদার উনানের আগুন তখন বেশ গনগনে হয়ে জ্বলছে। আমাদের চায়ের জন্য এক হাঁড়ি ফুটন্ত জল নামিয়ে দিয়েই হরিদা তাঁর ভাতের হাঁড়িটাকে উনানে চড়ালেন।

শহরের সবচেয়ে সরু এই গলিটার ভিতরে এই ছোট্ট ঘরটাই হরিদার জীবনের ঘর; আর আমাদের চারজনের সকাল-সন্ধ্যার আড্ডার ঘর। চা চিনি আর দুধ আমরাই নিয়ে আসি। হরিদা শুধু তাঁর উনানের আগুনের আঁচে জল ফুটিয়ে দেন।

খুবই গরিব মানুষ হরিদা। কিন্তু কাজ করতে হরিদার প্রাণের মধ্যেই যেন একটা বাধা আছে। ইচ্ছে করলে কোনো অফিসের কাজ, কিংবা কোনো দোকানের বিক্রিওয়ালার কাজ পেয়ে যেতে পারেন হরিদা; কিন্তু ওই ধরনের কাজ হরিদার জীবনের পছন্দই নয়। একেবারে ঘড়ির কাঁটার সামনে সময় বেঁধে দিয়ে আর নিয়ম করে নিয়ে রোজই একটা চাকরির কাজ করে যাওয়া হরিদার পক্ষে সম্ভব নয়। হরিদার উনানের হাঁড়িতে অনেক সময় শুধু জল ফোটে, ভাত ফোটে না। এই একঘেয়ে অভাবটাকে সহ্য করতে হরিদার আপত্তি নেই, কিন্তু একঘেয়ে কাজ করতে ভয়ানক আপত্তি।

হরিদার জীবনে সত্যিই একটা নাটকীয় বৈচিত্র্য আছে। আর, সেটাই যে হরিদার জীবনের পেশা। হরিদা মাঝে মাঝে বহুরূপী সেজে যেটুকু রোজগার করেন, তাতেই তাঁর ভাতের হাঁড়ির দাবি মিটিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। মাঝে মাঝে সত্যিই উপোস করেন হরিদা। তারপর একদিন হঠাৎ আবার এক সকালে কিংবা সন্ধ্যায় বিচিত্র ছদ্মবেশে অপরূপ হয়ে পথে বের হয়ে পড়েন। কেউ চিনতে পারে না। যারা চিনতে পারে এক-আনা দু-আনা বকশিশ দেয়। যারা চিনতে পারে না, তারা হয় কিছুই দেয় না, কিংবা বিরক্ত হয়ে দুটো-একটা পয়সা দিয়ে দেয়।

একদিন চকের বাস স্ট্যান্ডের কাছে ঠিক দুপুরবেলাতে একটা আতঙ্কের হল্লা বেজে উঠেছিল। একটা উন্মাদ পাগল; তার মুখ থেকে লালা ঝরে পড়ছে, চোখ দুটো কটকটে লাল। তার কোমরে একটা ছেঁড়া কম্বল জড়ানো, গলায় টিনের কৌটার একটা মালা। পাগলটা একটা থান ইট হাতে তুলে নিয়ে বাসের উপরে বসা যাত্রীদের দিকে তেড়ে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠছে যাত্রীরা, দুটো একটা পয়সা ফেলেও দিচ্ছে।

একটু পরেই বাসের ড্রাইভার কাশীনাথ ধমক দেয়। — খুব হয়েছে হরি, এই বার সরে পড়ো। অন্যদিকে যাও।

অ্যাঁ? ওটা কি একটা বহুরূপী? বাসের যাত্রীরা কেউ হাসে, কেউ বা বেশ বিরক্ত হয়, কেউ আবার বেশ বিস্মিত। সত্যিই, খুব চমৎকার পাগল সাজতে পেরেছে তো লোকটা।

হরিদার জীবন এইরকম বহু রূপের খেলা দেখিয়েই একরকম চলে যাচ্ছে। এই শহরের জীবনে মাঝে মাঝে বেশ চমৎকার ঘটনা সৃষ্টি করেন বহুরূপী হরিদা। সন্ধ্যার আলো সবেমাত্র জ্বলেছে, দোকানে দোকানে লোকজনের ব্যস্ততা আর মুখরতাও জমে উঠেছে। হঠাৎ পথের উপর দিয়ে ঘুঙুরের মিষ্টি শব্দ রুমঝুম করে বেজে-বেজে চলে যেতে থাকে। এক রূপসি বাইজি প্রায় নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে। শহরে যারা নতুন এসেছে, তারা দুই চোখ বড়ো করে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু দোকানদার হেসে ফেলে — হরির কাণ্ড।

অ্যাঁ? এটা একটা বহুরূপী নাকি? কারও কারও মুগ্ধ চোখের মোহভঙ্গ হয়, আর যেন বেশ একটু হতাশস্বরে প্রশ্ন করে ওঠে।

বাইজির ছদ্মবেশে সেদিন হরিদার রোজগার মন্দ হয়নি। মোট আট টাকা দশ আনা পেয়েছিলেন। আমরাও দেখেছিলাম, এক-একটা দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সেই রূপসি বাইজি, মুচকি হেসে আর চোখ টিপে একটা ফুলসাজি এগিয়ে দিচ্ছে। দোকানদারও হেসে ফেলে আর একটা সিকি তুলে নিয়ে বাইজির হাতের ফুলজাসির উপর ফেলে দেয়।

কোনদিন বাউল, কোনদিন কাপালিক। কখনও বোঁচকা কাঁধে বুড়ো কাবুলিওয়ালা, কখনও হ্যাট-কোট-পেন্টলুন-পরা ফিরিঙ্গি কেরামিন সাহেব। একবার পুলিশ সেজে দয়ালবাবুর লিচু বাগানের ভিতরে দাঁড়িয়েছিলেন হরিদা; স্কুলের চারটে ছেলেকে ধরেছিলেন। ভয়ে কেঁদে ফেলেছিল ছেলেগুলো; আর স্কুলের মাস্টার এসে সেই নকল পুলিশের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন—এবারের মতো মাপ করে দিন ওদের। কিন্তু আটআনা ঘুষ নিয়ে তারপর মাস্টারের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন সেই নকল-পুলিশ হরিদা।

পরদিন অবশ্য স্কুলের মাস্টারমশাইয়ের জানতে বাকি থাকেনি, কাকে তিনি আটআনা ঘুষ দিয়েছেন। কিন্তু মাস্টারমশাই একটুও রাগ করেননি। বরং একটু তারিফই করলেন—বা, সত্যি, খুব চমৎকার পুলিশ সেজেছিল হরি!

আজ এখন কিন্তু আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না, হরিদা এত গম্ভীর হয়ে কী ভাবছেন। সন্ন্যাসীর গল্পটা শুনে কি হরিদার মাথার মধ্যে নতুন কোনো মতলব ছটফট করে উঠেছে?

ঠিকই, আমাদের সন্দেহ মিথ্যে নয়। হরিদা বললেন—আজ তোমাদের একটা জবর খেলা দেখাব।

—আমাদের দেখিয়ে আপনার লাভ কি হরিদা? আমাদের কাছ থেকে একটা সিগারেটের চেয়ে বেশি কিছু তো পাবেন না।

হরিদা—না, ঠিক তোমাদের দেখাব না। আমি বলছি তোমরা সেখানে থেকো। তাহলে দেখতে পাবে...।

—কোথায়?

হরিদা—আজ সন্ধ্যায় জগদীশবাবুর বাড়িতে।

—হঠাৎ জগদীশবাবুর বাড়িতে খেলা দেখাবার জন্যে আপনার এত উৎসাহ জেগে উঠল কেন?

হরিদা হাসেন—মোটা মতন কিছু আদায় করে নেব। বুঝতেই তো পারছ, পুরো দিনটা রূপ ধরে ঘুরে বেড়িয়েও দু-তিন টাকার বেশি হয় না। একবার বাইজি সেজে অবিশ্যি কিছু বেশি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ওতেই বা কি হবে?

ঠিকই বলেছেন হরিদা। সপ্তাহে বড়োজোর একটা দিন বহুরূপী সেজে পথে বের হন হরিদা। কিন্তু তাতে সাতদিনের পেট চলবার মতো রোজগার হয় না।

হরিদা বলেন—নাঃ, এবার আর কাঙালের মতো হাত পেতে বকশিস নেওয়া নয়। এবার মারি তো হাতি, লুঠি তো ভাণ্ডার। একবারেই যা ঝেলে নেব তাতে আমার সারা বছর চলে যাবে।

কিন্তু সে কী করে সম্ভব? জগদীশবাবু ধনী মানুষ বটেন, কিন্তু বেশ কৃপণ মানুষ। হরিদাকে একটা যোগী সন্ন্যাসী কিংবা বৈরাগী সাজতে দেখে কত আর খুশি হবেন জগদীশবাবু? আর খুশি হলেই বা কত আনা বকশিশ দেবেন। পাঁচ আনার বেশি তো নয়।

হরিদা বলেন—তোমরা যদি দেখতে চাও, তবে আজ ঠিক সন্ধ্যাতে জগদীশবাবুর বাড়িতে থেকো।

আমরা বললাম—থাকব; আমাদের স্পোর্টের চাঁদা নেবার জন্যে আজ ঠিক সন্ধ্যাতেই জগদীশবাবুর কাছে যাব!

২

বড়ো চমৎকার আজকে এই সন্ধ্যার চেহারা। আমাদের শহরের গায়ে কতদিন তো চাঁদের আলো পড়েছে, কিন্তু কোনোদিন তো আজকের মতো এমন একটা স্নিগ্ধ ও শান্ত উজ্জ্বলতা কখনও চারদিকে এমন সুন্দর হয়ে ফুটে ওটেনি।

ফুরফুর করে বাতাস বইছে। জগদীশবাবুর বাড়ির বাগানের সব গাছের পাতাও ঝিরিঝিরি শব্দ করে কী যেন বলতে চাইছে। জগদীশবাবুর বাড়ির বারান্দাতে মস্ত বড়ো একটা আলো জ্বলছে। সেই আলোর কাছে একটা চেয়ারের উপর বসে আছেন জগদীশবাবু। সাদা মাথা, সাদা দাড়ি, সৌম্য শান্ত ও জ্ঞানী মানুষ জগদীশবাবু। আমরা আমাদের স্পোর্টের চাঁদার খাতাটিকে জগদীশবাবুর হাতে তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

চমকে উঠলেন জগদীশবাবু। বারান্দার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে জগদীশবাবুর দুই বিস্মিত চোখ অপলক হয়ে গেল।

আমরাও চমকে উঠেছি বইকি। আশ্চর্য হয়েছি, একটু ভয়ও পেয়েছি। কারণ, সত্যিই যে বিশ্বাস করতে পারছি না, সিঁড়ির কাছে এসে যে দাঁড়িয়েছে, সে কি সত্যিই হরিদা? ও চেহারা কি সত্যিই কোনো বহুরূপীর হতে পারে?

জটাজূটধারী কোনো সন্ন্যাসী নয়। হাতে কমণ্ডলু নেই, চিমটে নেই। মৃগচর্মের আসনও সঙ্গে নেই। গৈরিক সাজও নেই।

আদুড় গা, তার উপর একটি ধবধবে সাদা উত্তরীয়। পরনে ছোটো বহরের একটি সাদা থান।

মাথায় ফুরফুর করে উড়ছে শুকনো সাদা চুল। ধুলো মাখা পা, হাতে একটা ঝোলা, সে ঝোলার ভিতরে শুধু একটা বই, গীতা। গীতা বের করে কী-যেন দেখলেন এই আগন্তুক। তারপর নিজের মনেই হাসলেন।

আগন্তুক এই মানুষটি যেন এই জগতের সীমার ওপার থেকে হেঁটে হেঁটে চলে এসেছেন। শীর্ণ শরীরটাকে প্রায় অশরীরী একটা চেহারা বলে মনে হয়। কী অদ্ভুত উদাত্ত শান্ত ও উজ্জ্বল একটা দৃষ্টি এই আগন্তুকের চোখ থেকে ঝরে পড়ছে!

উঠে দাঁড়ালেন জগদীশবাবু—আসুন।

আগন্তুক হাসেন—আপনি কি ভগবানের চেয়েও বড়ো?

জগদীশবাবু কিছু ভেবে বলেন—কেন? কেন আপনি একথা কেন বলছেন মহারাজ?

আমি মহারাজ নই, আমি এই সৃষ্টির মধ্যে এককণা ধূলি। —কিন্তু আপনি বোধহয় এগারো লক্ষ টাকার সম্পত্তির অহংকারে নিজেকে ভগবানের চেয়েও বড়ো বলে মনে করেন। তাই ওখানেই দাঁড়িয়ে আছেন, নেমে আসতে পারছেন না।

সেই মুহূর্তে সিঁড়ি ধরে নেমে যান জগদীশবাবু। —আমার অপরাধ হয়েছে। আপনি রাগ করবেন না।

আগন্তুক আবার হাসেন—আমি বিরাগী, রাগ নামে কোনো রিপু আমার নেই। ছিল একদিন, সেটা পূর্বজন্মের কথা।

জগদীশবাবু—বলুন, এখন আপনাকে কীভাবে সেবা করব?

বিরাগী বলেন—ঠান্ডা জল চাই, আর কিছু চাই না।

ঠান্ডা জল খেয়ে নিয়ে হাঁপ ছাড়েন বিরাগী। এদিকে ভবতোষ আমার কানের কাছে ফিসফিস করে। —না না, হরিদা নয়। হতেই পারে না। অসম্ভব! হরিদার গলার স্বর এরকমেরই নয়।

বিরাগী বলেন—পরম সুখ কাকে বলে জানেন? সব সুখের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া!

ভবতোষের কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে অনাদি বলে—শুনছো তো? এসব ভাষা কি হরিদার মুখের ভাষা হতে পারে?

জগদীশবাবু ততক্ষণে সিঁড়ির উপরে বসে পড়েছেন। বোধহয় বিরাগীর পা স্পর্শ করবার জন্যে তাঁর হাত দুটো ছটফট করতে শুরু করেছে। জগদীশবাবু বলেন—আমার এখানে কয়েকটা দিন থাকুন বিরাগীজি। আপনার কাছে এটা আমার প্রাণের অনুরোধ। দুই হাত জোড় করে বিরাগীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন জগদীশবাবু।

বিরাগী হাসেন—বাইরে খোলা আকাশ থাকতে আর ধরিত্রীর মাটিতে স্থান থাকতে, আমি এক বিষয়ীর দালান বাড়ির ঘরে থাকব কেন, বলতে পারেন?

—বিরাগীজি! জগদীশবাবুর গলার স্বরের আবেদন করুণ হয়ে ছলছল করে।

বিরাগী বলেন—না, আপনার এখানে জল খেয়েছি, এই যথেষ্ট। পরমাত্মা আপনার কল্যাণ করুন। কিন্তু আপনার এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

জগদীশবাবু—তবে অন্তত একটু কিছু আজ্ঞা করুন, যদি আপনাকে কোনো...।

বিরাগী—না না, আমি যার কাছে পড়ে আছি, তিনি আপনার চেয়ে কিছু কম নয়। কাজেই আপনার কাছে আমার তো কিছু চাইবার দরকার হয় না।

জগদীশবাবু—তবে কিছু উপদেশ শুনিয়ে যান বিরাগীজি, নইলে আমি শান্তি পাব না।

বিরাগী—ধন জন যৌবন কিছুই নয় জগদীশবাবু। ওসব হলো সুন্দর সুন্দর এক-একটি বঞ্চনা। মন-প্রাণের সব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শুধু সেই একজনের আপন হতে চেষ্টা করুন, যাঁকে পেলে এই সৃষ্টির সব ঐশ্বর্য পাওয়া হয়ে যায়। ...আচ্ছা আমি চলি।

জগদীশবাবু বলেন—আপনি একটা মিনিট থাকুন বিরাগীজি।

সিঁড়ির উপরে অচঞ্চল হয়ে একটা মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন বিরাগী। আজকের চাঁদের আলোর চেয়েও স্নিগ্ধ হয়ে এক জ্যোৎস্না যেন বিরাগীর চোখ থেকে ঝরে পড়ছে। ভবতোষ ফিসফিস করে—না না, ওই চোখ কি হরিদার চোখ হতে পারে? অসম্ভব!

জগদীশবাবুর হাতে একটা থলি। থলির ভিতরে নোটের তাড়া। বিরাগীর পায়ের কাছে থলিটাকে রেখে দিয়ে ব্যাকুল স্বরে প্রার্থনা করেন জগদীশবাবু—এই প্রণামী, এই সামান্য একশো এক টাকা গ্রহণ করে আমাকে শান্তি দান করুন বিরাগীজি। আপনার তীর্থ ভ্রমণের জন্য এই টাকা আমি দিলাম।

বিরাগী হাসেন—আমার বুকের ভিতরেই যে সব তীর্থ। ভ্রমণ করে দেখবার তো কোনো দরকার হয় না।

জগদীশবাবু—আমার অনুরোধ বিরাগীজি...।

বিরাগী বলেন—আমি যেমন অনায়াসে ধুলো মাড়িয়ে চলে যেতে পারি, তেমনই অনায়াসে সোনাও মাড়িয়ে চলে যেতে পারি।

বলতে বলতে সিঁড়ি থেকে নেমে গেলেন বিরাগী। একশো এক টাকার থলিটা সিঁড়ির উপরেই পড়ে রইল। সেদিকে ভুলেও একবার তাকালেন না বিরাগী।

৩

—কী করছেন হরিদা কী হলো? কই? আজ যে বলেছিলেন জবর খেলা দেখাবেন, সে-কথা কি ভুলেই গেলেন। আজকের সন্ধ্যাটা ঘরে বসেই কাটিয়ে দিলেন কেন?

বলতে বলতে আমরা সবাই হরিদার ঘরের ভিতরে ঢুকলাম।

হরিদার উনানের আগুন তখন বেশ গনগনে হয়ে জ্বলছে। উনানের উপর হাঁড়িতে চাল ফুটছে। আর, একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে হরিদা চুপ করে বসে আছেন। আমাদের দেখতে পেয়েই লজ্জিতভাবে হাসলেন।

—কী আশ্চর্য! চমকে ওঠে ভবতোষ। —হরিদা, আপনি তাহলে সত্যিই বের হয়েছিলেন! আপনিই বিরাগী?

হরিদা হাসেন—হ্যাঁ রে ভাই।

ওই তো সেই সাদা উত্তরীয়টা পড়ে রয়েছে মাদুরের উপর, আর সেই ঝোলাটা আর সেই গীতা।

অনাদি বলে—এটা কী কাণ্ড করলেন, হরিদা? জগদীশবাবু তো অত টাকা সাধলেন, অথচ আপনি একেবারে খাঁটি সন্ন্যাসীর মতো সব তুচ্ছ করে সরে পড়লেন?

হরিদা—কী করব বল? ইচ্ছেই হলো না। শত হোক...।

ভবতোষ—কী?

হরিদা—শত হোক, একজন বিরাগী সন্ন্যাসী হয়ে টাকা-ফাকা কী করে স্পর্শ করি বল? তাতে যে আমার ঢং নষ্ট হয়ে যায়।

কী অদ্ভুত কথা বললেন হরিদা! হরিদার একথার সঙ্গে তর্ক চলে না। আর, বুঝতে অসুবিধে নেই, হরিদার জীবনের ভাতের হাঁড়ি মাঝে মাঝে শুধু জল ফুটিয়েই সারা হবে। অদৃষ্ট কখনও হরিদার এই ভুল ক্ষমা করবে না।

অনাদি বলে—কিন্তু আপনি কি জগদীশবাবুর কাছে গিয়ে আর কখনও...।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠেন হরিদা—যাবই তো। না গিয়ে উপায় কী? গিয়ে অন্তত বকশিশটা তো দাবি করতে হবে?

—বকশিশ? চেঁচিয়ে ওঠে ভবতোষ। সেটা তো বড়োজোর আট আনা কিংবা দশ আনা।

হরিদা বিড়ি মুখে দিয়ে লজ্জিতভাবে হাসেন—কী আর করা যাবে বল? খাঁটি মানুষ তো নয়, এই বহুরূপীর জীবন এর বেশি কী আশা করতে পারে?

সুবোধ ঘোষ (১৯১০ — ১৯৮০) : প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ বিহারের হাজারিবাগে জন্মগ্রহণ করেন। আদিনিবাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর মহকুমার বহর গ্রামে। বিচিত্র কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এই লেখকের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হলো— 'পরশুরামের কুঠার', 'শুক্লাভিসার', 'ফসিল', 'তিলাঞ্জলি', 'গঙ্গোত্রী', 'একটি নমস্কারে', 'ত্রিযামা', 'ভারত প্রেমকথা', 'জতুগৃহ', 'কিংবদন্তীর দেশে', 'ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস', 'ক্যাকটাস' ইত্যাদি। ছোটোগল্প ছাড়াও তিনি বহু উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী' স্বর্ণপদক লাভ করেন।

অভিষেক

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ, প্রণমিয়া, ধাত্রীর চরণে,
কহিলা, — "কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি
এ ভবনে? কহ দাসে লঙ্কার কুশল।"

শিরঃ চুম্বি, ছদ্মবেশী অম্বুরাশি-সুতা
উত্তরিলা; — "হায়! পুত্র, কি আর কহিব
কনক-লঙ্কার দশা ! ঘোরতর রণে,
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী!
তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি,
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।"

জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া; —
"কি কহিলা, ভগবতি? কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে? নিশা-রণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে ; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে ; তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।"

রত্নাকর রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী
উত্তরিলা; — "হায়! পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি ; তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি ; রক্ষ রক্ষঃকুল-
মান, এ কালসমরে, রক্ষঃ- চূড়ামণি!

ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ; ফেলাইলা কনক-বলয়
দূরে; পদতলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়! "ধিক্ মোরে" কহিলা গম্ভীরে
কুমার, "হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ? আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।"

সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর-আভরণে,
হৈমবতীসুত যথা নাশিতে তারকে
মহাসুর; কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটী, বিরাটপুত্র সহ, উদ্ধারিতে
গোধন, সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে।
মেঘবর্ণ রথ; চক্র বিজলীর ছটা;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি। রথে চড়ে বীর-চূড়ামণি
বীরদর্পে, হেন কালে প্রমীলা সুন্দরী,
ধরি পতি-কর-যুগ (হায় রে যেমতি

হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু-কুলেশ্বরে)
কহিলা কাঁদিয়া ধনি; ''কোথা প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রয়ে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?'' হাসি উত্তরিলা
মেঘনাদ, ''ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি, তোমার কল্যাণে
রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি।''

উঠিল পবন-পথে ঘোরতর রবে,
রথবর, হৈমপাখা বিস্তারিয়া যেন
উড়িলা মৈনাক-শৈল অম্বর উজলি!
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে, টঙ্কারিলা ধনুঃ
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে
ভৈরবে। কাঁপিল লঙ্কা, কাঁপিল জলধি!

সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাতি;—

বাজিছে রণ-বাজনা; গরজিছে গজ;
হ্রেষে অশ্ব; হুঙ্কারিছে পদাতিক, রথী;
উড়িছে কৌশিক-ধ্বজ; উঠিছে আকাশে
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা। হেন কালে তথা,
দ্রুতগতি উতরিলা মেঘনাদ রথী।

নাদিলা কর্বুরদল হেরি বীরবরে
মহাগর্বে। নমি পুত্র পিতার চরণে,
করযোড়ে কহিলা;—"হে রক্ষঃ-কুল-পতি,
শুনেছি, মরিয়া না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব ? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি!
কিন্তু অনুমতি দেহ; সমূলে নির্মূল
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"

আলিঙ্গি কুমারে , চুম্বি শিরঃ, মৃদুস্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি;
"রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস; তুমি
রাক্ষস-কুল- ভরসা। এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি।
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে?"

উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু;—
"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে;
আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে;
দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে!"

কহিলা রাক্ষসপতি; —"কুম্ভকর্ণ, বলী
ভাই মম,— তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধু-তীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে! তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি!
সেনাপতি পদে আমি বরিণু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে;
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।"

এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—১৮৭৩) : জন্ম অধুনা বাংলাদেশের যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে। বাল্যবয়সেই কলকাতায় এসে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক প্রমুখ। গ্রিক, ল্যাটিন, সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। প্রথম জীবনে ইংরেজি ভাষায় দুটি গ্রন্থ রচনা করলেও পরবর্তী পর্যায়ে কবি মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'চতুর্দশপদী কবিতা' রচনার মধ্যে দিয়ে বাংলা কাব্য-কবিতার ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। 'রত্নাবলী', 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' প্রভৃতি নাটক এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক দুটি প্রহসন তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। 'পদ্মাবতী' নাটকে তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। 'অভিষেক' শীর্ষক কাব্যংশটি কবির 'মেঘনাদবধ কাব্য' -এর প্রথম সর্গ থেকে নেওয়া।